অরণ্যপথ

প্রবোধকুমার সান্যাল

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্থা
৭ই জুলাই, ১৯৬১

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রক
কমল মিত্র
নব মুদ্রন
১বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৯

স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মরণে

অরণ্যপথ

অরণ্যভূমি ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ ও প্রাচীন সংস্কৃতির জন্ম অরণ্য-তপোবনে, এবং অরণ্যভূমি সম্বন্ধে কিছু না জানলে আমাদের দেশকে জানা অনেকখানি বাকি থেকে যায়। আমি যদি এমন কথা বলি, ভারতবর্ষে প্রতি তিনশত বর্গমাইলের মধ্যে এক একটি বিশাল অরণ্য দেখা যায় তাহ'লে আশাকরি শহরবাসীরা বিস্মিত হবেন না। ভারতবর্ষের রহস্যলোক বহু ভারতবাসীর কাছেই অজ্ঞাত।

সুন্দরবন, টিরাই, মধ্যপ্রদেশ, কাংড়া, আসাম—এই সব জঙ্গলের আলোচনা অল্পসময়ের মধ্যে হয় না। কিন্তু পশ্চিম বাংলার নিকটবর্তী স্থানে যে বিশাল পার্বত্য অরণ্যভূমি অবস্থিত অনেকেই সে কথা জানেন। এই অরণ্যের বিস্তৃতি অতি ব্যাপক, এই ভূভাগে যে কয়েকটি নগর বিখ্যাত তাদের মধ্যে কোডারমা, গোমো, বড়কাকানা, হাজারিবাগ, পরেশনাথ, রাঁচি, গয়া, রাজগৃহ—প্রভৃতি সকলেরই পরিচিত। কিন্তু মোটরে বা ট্রেনে ভ্রমণকালে আমরা সাধারণত যে সব বনজঙ্গল দেখি, সুরক্ষিত গাড়ীর মধ্যে বসে যে সব চটকদার বাঘ-ভাল্লুকের গল্প শুনি—সত্যকার পায়ে হেঁটে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করলে আমাদের অনেক ধারণা বদলায়। যারা জন্তু শিকার করবার জন্য জঙ্গলে ঢুকে বাঘ মেরে এনে খবরের কাগজে নাম ছাপায় তারা হাত-তালি পায় বটে কিন্তু অরণ্যলোক তাদের কাছে অন্ধকারই থেকে যায়। অরণ্য তাদের চোখে আনন্দের তপোবন নয়, হিংসা পরিতৃপ্তির একটা রণস্থল মাত্র। নিরস্ত্র এবং অহিংস মন নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করতে তবেই অরণ্য-ভ্রমণের আনন্দ পাওয়া যায়।

অত্যন্ত গভীর যে সকল বনভূমি আছে সেখানেও দেখা যায় মানুষের বাসা। তারা জংলী, সভ্যতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। সামান্য চাষ-

আবাদ করে, বর্শা-বল্লম-তীর-ধনুক নিয়ে জন্তু শিকার করে, কাঠ কাটে, চামড়া বিক্রী করে। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তারা পাশাপাশি জীবনযাত্রা নির্বাহ ক'রে চলে। আর এক শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় তারা আরণ্যক, তাদের কোথাও স্থায়ী বসতি নেই। যেখানে সেখানে পাতার ঘর বেঁধে মজুরি ক'রে তারা চালায়। অসতর্ক অবস্থায় জানোয়ারের কবলেও তারা প্রাণ হারায়।

বিহার প্রদেশের কয়েকটি বনভূমি আমি দেখেছি। এই অরণ্য একটির থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন নয়, কেবল নামের তফাৎ মাত্র। গোমো ও হাজারিবাগ থেকে যে অরণ্যের আরম্ভ, সেই অরণ্যই ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পশ্চিমে যুক্ত-প্রদেশের সীমা ও দক্ষিণে ছোটনাগপুরের দিকে চ'লে গেছে। ভারতবর্ষের সকল অরণ্যই প্রায় সমগোত্রীয়, তবে বৃষ্টিপাত ও নদীবাহুল্য যেদিকে বেশি, যেমন আসাম ও সুন্দরবন—সেদিকে ভ্রমণের অনেক সময়ে বিশেষ অসুবিধা। সুন্দরবনের সর্পভয় ও অন্যান্য সরীসৃপের আতঙ্ক বিহারের বনভূমিতে কম। আবার বিহারের জঙ্গলের জল-বাতাস যেমন ভালো এমন আসাম অথবা সুন্দরবনে নেই।

পরেশনাথ পাহাড় বাংলা দেশের নিকটেই, কিন্তু ওই সামান্য চার হাজার ফুট পাহাড় ও উপত্যকাকে ঘিরে প্রকৃতির যে অপূর্ব সৌন্দর্য তার তুলনা বড় কম। যাঁরা অধুনালুপ্ত ইস্‌রি স্টেশন থেকে নেমে পশ্চিম দিক ঘুরে পরেশ-নাথ পর্বত আরোহণ করেছেন তাঁরা জানেন, এদিকে গভীর শাল ইত্যাদির জঙ্গল। আগে এই সকল পথ খুবই দুর্গম ছিল কিন্তু ইদানীং শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দলের কৃপায় পথ-ঘাট চলনসই হয়ে উঠেছে। পরেশনাথের পার্বত্য অরণ্য বহুদিকে বিস্তৃত—অর্থাৎ নিমিয়া-ঘাটের দিকে উশ্রী ও গিরিডি অবধি। এই পরেশনাথের অরণ্য-দৃশ্য অতি মনোরম, অরণ্য অতিক্রম করে বহু ভ্রমণকারী চূড়ার উপরে উঠে মন্দির দর্শন করতে যান। সন্ধ্যার দিকে মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরেশনাথের পাদদেশে মা'ড়ায়ারির ধর্মশালায় ব'সে প্রায়ই রাত্রে সত্য সত্যই বাঘের গর্জন কানে আসে।

হাজারিবাগের পথ দিয়ে রাঁচি যাবার দিকে বহু জঙ্গল দেখা যায়।

শালের জঙ্গলই বেশী। শিকারীরা এই পথের দুধারে আগে জন্তু শিকার করতো। বন্য শূকর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শম্ভর, নীলগাই প্রভৃতি এখনো প্রচুর আছে কিন্তু তারা আগেকার মতো মোটর ধারে আর আসে না, প্রাণ দিয়ে দিয়ে তারা চতুর হয়ে গেছে।

গয়া জেলার জঙ্গল বিহারে বিশেষ বিখ্যাত। এখানকার অরণ্য পার্বত্য-ময়, সেইজন্য প্রায়ই দুর্গম। রাজগৃহ পর্বতমালার শাখা-প্রশাখা, তার সঙ্গে ছোট ছোট নির্ঝরিণী, জলপ্রপাত, গুহাগহ্বর,—অথচ মানুষের বসতি কম। এদিকে নানাভাগে শত শত মাইল জঙ্গল। যে সকল কেন্দ্রগুলি শিকারীর নিকট বিশেষ পরিচিত তাদের মধ্যে কাহুডাক, রজৌলী, একতারা, জনকপুর, মহাদেবপুর ইত্যাদি বিখ্যাত। আমি দু'চারটির কথা বলতে পারবো। পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ভ্রমণ করা দুঃসাধ্য, বাইরের দিকে অল্প-স্বল্প দেখা যায় বটে কিন্তু অন্দরমহলে প্রবেশ করা যায় না। এমন অবস্থায় 'শব্দহীন' মোটর যোগে ভ্রমণ করাই বিধি। বন্দুক সঙ্গে রাখা দরকার কিন্তু যতদূর সম্ভব সংযম পালন করা উচিত। মোটরে চ'ড়ে শিকার করতে যাওয়া মানেই হত্যার নেশা। হত্যার উদ্দেশ্যে গেলেই সমস্ত অরণ্যলোক আতঙ্কে যেন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, এবং তা'তে ফল এই হয় যে, অরণ্যভ্রমণের আনন্দ অনেকটা ব্যাহত হয়। একটা বন্দুকের আওয়াজ হলেই অরণ্য স্তব্ধ ও অসাড় হয়ে যায়, জীবজন্তুরা সতর্ক হয়ে আত্মোগোপন করে। কাহুডাক, একতারা প্রভৃতি জঙ্গলে আমি এর প্রমাণ পেয়েছি। অরণ্যে প্রবেশ করতে হয় অতি নিঃশব্দে আত্মগোপন ক'রে—যদি নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটাকেও চেপে রাখা যায় সে চেষ্টাও করা উচিত। কথাবার্তা, সিগারেট-জ্বালানো, মোটরের কোনোরূপ সাড়াশব্দ—অর্থাৎ এমন কোনো সামান্য অশান্তি, যাতে অরণ্যের ঘুম ভেঙে যায়, সেই কাজ করা চলবে না। সাধারণত জঙ্গলে গিয়ে একথা মনে করা স্বাভাবিক যে, চারিদিকে কোথাও জীবজন্তু নেই, বেশ নিরিবিলি। কিন্তু সেটা ভুল, অতি নিকটেই চারিদিকে সব কিছুরই অস্তিত্ব আছে, আমরা কেবল চোখে দেখতে পাইনে। মানুষের অপেক্ষা তাদের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল, দৃষ্টি ও চৈতন্য অতি সজাগ, আনাগোনা অতি নিঃশব্দ ও গোপন। সেইজন্য জঙ্গলের মধ্যে অনাত্মীয় কোনো মানুষ পদার্পণ করলেই তাদের জগতে

নিঃশব্দে একটা সাড়া প'ড়ে যায়, তারা সতর্ক হয়ে একটা ব্যবধানের আড়ালে চ'লে যেতে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায়, নরখাদক ব্যাঘ্র অথবা বন্যশূকর সহসা নোটিশ না দিয়েই অতর্কিত অবস্থায় ছুটে এসে আক্রমণ করে, কিম্বা দেখা যায় দূরে কোথাও একটা গর্জন শোনামাত্র সমস্ত অরণ্য নিঃসাড় হয়ে যায়। তারপর বহু চেষ্টা করেও আর কোন জন্তু জানোয়ারের দর্শন মেলে না।

সকল বনভূমিই সকল সময়ে জীবজন্তু ও সরীসৃপে পরিপূর্ণ। অরণ্যই তাদের নিরাপদ আশ্রয়, অরণ্যস্বভাবের সঙ্গে তারা জীবনযাত্রার সুর মিলিয়ে জীবন-ধারণ করে। অদ্ভুত পাখীর দল গাছে গাছে, বানর ও হনুমানের প্রকাণ্ড উপনিবেশ, নামহারা সব অতিকায় সরীসৃপ, কোটরে কোটরে বিষাক্ত রঙীন সাপ, বিচিত্র পিপীলিকা ও পতঙ্গ, ভয়ঙ্কর নামহারা কীটের দল,—জীবজন্তুতে সকল সময় জঙ্গল ঠাসা। এক এক সময় দেখা যায়, কোনো এক জঙ্গলে কোনো প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। তখন বুঝতে হবে এটা বাঘের জঙ্গল। কারণ বাঘ এতই হিংস্র যে, তার নিকটবর্তী সকল জঙ্গলেই অন্য প্রাণী নিরাপদ নয়। খরগোশ, হরিণ, হায়না, শূকর, শম্ভর, এমন কি শৃগাল ও বনকুকুর অবধি সে-রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র পালায়। বাঘের স্বভাব রাজোচিত। ভিতরে যতই হিংস্র, ততই যেন উদাসীন। সাম্রাজ্যবাদীর মতো অহঙ্কারে ও আভিজাত্যে সর্বদাই সে নতমস্তক। অন্তরে সে ভয়ানক চতুর, সন্দিগ্ধ, লোভী, কুটীল—কিন্তু বাইরে সে নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, মৃদু-মন্থর, চোখ দুটো তপস্যায় যেন নিমীলিত। তার আবির্ভাবে সমগ্র বনস্পতি যেন ভয়ে আড়ষ্ট। হঠাৎ একটু অপ্রাকৃত আওয়াজ, অমনি বাঘের ঘুম ভাঙে। মুখ তুলে সে তাকায় অরণ্যদেবতার দিকে, যদি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ মনে জাগে অমনি অন্যপথে চলতে থাকে। কেবল ল্যাজের একটি ঝাপট দিয়ে গুরু গুরু পদভরে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে চলে যায়।

শুক্লপক্ষের রাত্রে খাকি পোশাক প'রে অরণ্যে প্রবেশ করা উচিত। নিজেকে কোনো রকমেই সুস্পষ্ট করা চলবে না। জঙ্গলে গাছপালা, লতা পাতা সকলের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে একাকার ক'রে দিতে না পারলে কিছু

জানা যায় না। আমরা যখন অমাবস্যার রাত্রে জনকপুর জঙ্গলে প্রবেশ করলুম, আমাদের প্রাণ-চৈতন্যকে অতি নিবিড়ভাবে অনুভব করছিলুম। চারিদিকে যেন প্রকাণ্ড এক পরিবার, আমরা তাদের মাঝখানে বিদেশী অতিথি। প্রবেশ করবার আগে অন্তরে একটি আতঙ্ক ছিল, কিন্তু সেই গভীর তপস্যা-লোকে প্রবেশ ক'রে একটি নিগূঢ় আনন্দ ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে উঠেছে। অরণ্যের জটিল জটায় আর শিকড়ে শিকড়ে যেন একটি সুপ্রাচীন ভাষা শোনা যায়। গাছের কোটরে, রন্ধ্রে, পত্রপল্লবে কীটদলের কেমন করকরানি, পাখীর তন্দ্রা-ভাঙার শব্দ, সাপের বুকে-হাঁটার আওয়াজ, জন্তুর নিশ্বাস, খরগোস ও শৃগালের চলাফেরা, বাদুড়ের ঝাপটা, বাঘের ঘুপঘুপ শব্দ,—এদের সঙ্গে যেন সব প্রেতলোকের ছায়াচারীদের নিঃশব্দ চলা-ফেরা। যেন কোথায় অন্ধকারে একটা বিরাট উৎসব চলছে, সবাই যেন সেই উৎসবের চারিধারে সমবেত। চোখ বুজে থাকা আর চোখ খুলে রাখা একই কথা, একই অন্ধকার। নিশ্বাস রোধ ক'রে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াও। সহসা দ্রুত লঘু পদশব্দ। চারিদিক থেকে কয়েকটা বনকুকুর ছুটে গেল। তারপর অনেক দূরে শোনা গেল আহত হরিণের আর্তনাদ, সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো ব্যাঘ্রের একটা নাসাগর্জন, ভালুকের ডাক—অরণ্যের ধ্যান চুরমার হয়ে গেল। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, নিরপরাধ হরিণকে হত্যা করার একটি ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। বনকুকুর কয়েকটা হরিণকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করেছে। বাঘ জানতে পেরেছে কিন্তু কুকুরের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে নিজে আত্মসাৎ করতে না পেরে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। ভালুক আওয়াজ দিয়ে তার ভয়ানক ক্ষুধা জানিয়ে দিলে। চতুর চিতাবাঘ ওৎ পেতে কুকুরের কবল থেকে হরিণকে নিয়ে পালাবার আয়োজন করছে।

এমন মুহূর্তে তুমি সহসা স্পট্ লাইট ফেলে চেয়ে দেখো অরণ্যের রূপ। অন্ধকারের গভীরতা ভেদ ক'রে তোমার তীব্র টর্চের আলোও বেশিদূর যেতে পারবে না। চেয়ে দেখো জটাজূটধারী ঋষি বনস্পতি তাঁর বীজমন্ত্রে সমস্ত শ্বাপদ-কুলকে বশীভূত করেছেন। তোমার টর্চের আলোয় অভিভূত সহস্র সহস্র জীবজন্তুর চক্ষু, আলোর তীব্রতায় সহসা তাদের চক্ষে ধাঁধা লেগেছে।

কোনো চক্ষু নীল, কোনোটা কপিশ, কোনোটা হরিদ্রাভ, কোনোটা বা শ্বেতাভ কৃষ্ণ। কিন্তু ওদের মধ্যে যে-দৃষ্টি উজ্জ্বল লোহিতবরণ—তিনিই হলেন স্বয়ং শার্দূলরাজ। তোমার আলোকমন্ত্রে সবাই স্তব্ধ, তুমি সেই মুহূর্তে অরণ্যের হিংস্রতা অরণ্যের তপস্যা-নিমীলিত-সৌন্দর্য দেখে নাও। তারপর কারুকে হত্যা না ক'রে আলো নিবিয়ে সাবধানে নিঃশব্দে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চ'লে যাও।

"Adventure is always there for the adventurous, and the wide world still beckons to those who have courage and spirit and the stars hurl their challenge across the skies...To them life is a continual challenge, a long adventure, a testing of their worth"

—Jawaharlal

আশা আর আকাঙ্ক্ষা অনেক বড়, ইচ্ছা বহুদূরপ্রসারী—কিন্তু শক্তি ও সুবিধা বড় কম। যা হবার সাধ ছিল, যা হ'য়ে উঠতে পারেনি—মানুষের সেইটেই বড় পরিচয়। আমাকে কেন্দ্র ক'রে আমার চারদিকে যা কিছু গ'ড়ে উঠছে তার প্রতি আমার মনের সায় নেই, মিল নেই—সেইজন্য যত প্রয়োজনই তাদের থাক্, কল্যাণের যত পথকেই তারা মসৃণ করুক, তাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা নেই। দাবি মিটাবার জন্য তারা হয়ত ভোটের অধিকার পাবে, কিন্তু তাদের চিরদিনই অবহেলা ক'রে চলবে। আমি তা'কে চাই যাকে পাইনি, পাওয়া যায় না। তাকে জানতে চাই, যা অজানা, যা জানা যায় না। আমি বাঁশী শুনে বেরিয়ে পড়ি, কিন্তু বাঁশী যে বাজায়—সে কেমন, সে কোথায়, সে কোন্‌পথে, সে কতদূরে! যে ক্ষুধায় বিজ্ঞানের জন্ম, যে ক্ষুধায় মেরু আবিষ্কার, যে ক্ষুধায় গৌরীশৃঙ্গ অভিযান—সেই প্যাশনএর স্ফুলিঙ্গ ছুঁয়ে গেছে আমার বাল্যচরিত্রকে; তার আগুন মরে গেছে, উত্তাপটা আজও অনুভব করি। আজও তার ঋণ শোধ হয়নি।

নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মেয়েরা মানিয়ে চলে, কিন্তু পুরুষেরা তাকে নিয়ত অতিক্রম করে। এই প্রকৃতি পুরুষের সহজাত। এই প্রকৃতির তাড়নায় তারা ছুটে যায় জলে, জঙ্গলে, পর্বতে, নিরুদ্দেশে; এই প্রকৃতির তাড়নায় পরমার্থ লাভের জন্য তারা সন্ন্যাসীও সাজে। বিধির সঙ্গে বিবাদ, তাই পুরুষেরা হয় বন্দী, হয় বিপ্লবী। যে কামনায় তারা ঘর বাঁধে, সেই কামনায় তারা ঘর ভাঙে। শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা পুরুষের, যুদ্ধের আয়োজন করে পুরুষরাই। অহিংসাবাদ প্রচার ক'রে বেড়ানো তাদের

আনন্দ, নিরীহ পাখীর বুকে অস্ত্রাঘাত করাও তাদের উল্লাস। নারীকে দেবীর আসনে বসায় পুরুষ, নারীকে পতিতা বানায় পুরুষ, পুরুষের হাতে পৃথিবী বন্দিনী। ব্রহ্মা হলেন পুরুষ, পুরুষ হোলো পুরুষোত্তম।

পথে, প্রান্তরে, নদীতটে, অরণ্যে—বন্দুকধারী শিকারীর যে আনন্দ, সাহিত্যিকের আনন্দ তার সঙ্গে মেলে না। শিকারীর চোখ কেবল শিকারের প্রতি, সাহিত্যিকের চোখ শিকার ছাড়া আর সব দিকে। অরণ্য কথা বলে, বনময় প্রান্তর রৌদ্রে বসে জপ করে, পাখীরা নিভৃতে তাদের সংসার চালায়, রূপবান জানোয়ারের দল পরস্পর আলাপ করে, কীট-পতঙ্গরা রহস্যময় ভাষায় পরস্পরকে অভিনন্দন জানায়,—এবং মানুষ গিয়ে দাঁড়ালে সকলে মুখ চাওয়া-চায়ি করে, এই দৃশ্যটা অভিনব। এর আকর্ষণ অসামান্য! ওদের চোখে মানুষ হোলো অভিনব জানোয়ার, তাই মানুষকে দেখলে হয় ওরা তেড়ে মারতে আসে, নয়ত আতঙ্কিত হয়ে ছুটে পালায়।

উপরে যে মহামান্য জননেতার বাণী উদ্ধৃত করেছি তিনিও একদা বেরিয়ে পড়েছিলেন শিকারের সন্ধানে। কিন্তু আহত হরিণের সজল চক্ষু দেখে তার নেশা গিয়েছিল ছুটে। হত্যার পিপাসা অবশ্যম্ভাবী অবসাদ আনে, সেইজন্য দেখা যায় অনেক শিকারী শেষ বয়সে সামান্য পিপীলিকাটিকে পর্যন্ত স্নেহচ্ছায়ায় লালন করেন। এটা হিংসারই প্রতিক্রিয়া। অরণ্যের একটি অতি রহস্যময় আকর্ষণ আছে, সেটি তার অদ্ভুত গাম্ভীর্যরূপ, সে-বস্তুটি নিত্যনূতন। অরণ্যের গভীরতা, সাগরের শোভা, পর্বতের মহিমা,—ভারতবর্ষের এই তিনটি বিশিষ্ট রূপ। এদের সঙ্গে যার পরিচয় নেই, ভারতবর্ষের মহনীয়তা তার কাছে অজ্ঞাত। ভারত-প্রদক্ষিণের আনন্দ পৃথিবী-পরিভ্রমণের আনন্দের সমতুল্য। কথাটা অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু ভারত ভ্রমণ ও শিকারযাত্রা—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে! প্রথমটিতে আছে নেশা, দ্বিতীয়টিতে চমক। এই চমকটা একেবারে নূতন, আগে এর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। এর উত্তেজনা ও বৈচিত্র্য, এর অবর্ণনীয় উৎসাহ সকল রকম ভ্রমণের নেশাকে ছাড়িয়ে যায়। বন্দুকের সহযাত্রী হওয়ায় জীবনের একটা নূতন স্বাদ আছে।

এই ভূমিকার পরেই পথে নামা। আয়োজন ও সরঞ্জাম আমাদের

প্রচুর। বন্দুক, রাইফেল, কার্তুজ, স্পটলাইট, টর্চ, খাদ্যসামগ্রী, শীতবস্ত্র, লাঠি-সড়কি, দড়ি-ছুড়ি,--কি নেই?

নূতন পাটনা শহরের মনোরম পথ বেয়ে আমাদের গাড়ী ছুটলো। ঘনতৃণদলে ছাওয়া পথ, দুধারে বৃক্ষশ্রেণী, লতা-বিতান,—অনেকটা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রশান্ত তপোবনের মতো। দূর দূরান্তর-বিস্তৃত প্রান্তর, ছায়ায় রৌদ্রে ঝিলমিলি জনবিরল মসৃণ পথ, মাঝে মাঝে বাগান বাড়ী, চারিদিকে যেন উদাস আলস্যের সুর আকাশ আর প্রান্তরজোড়া অখণ্ড অবকাশ। শীতের রোদ, সূর্যকিরণে জড়ানো বাতাস মুখে চোখে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে চলেছে।

শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে। নাম না জানা নানা গ্রাম। কাঁচা মাটির মেঠো পথে গাড়ী চললো। এই পথটা আরঙ্গবাদ হয়ে গয়ার দিকে গেছে, মাঝপথে জাহানাবাদ। আমাদের গাড়ী একটা খালের ধার বেয়ে চলতে লাগলো।

পথ তেমনই জনবিরল। পাশেই খালের নির্মল জলস্রোত ব'য়ে চলেছে। দুইধারে কাঁচাপাকা আমন ধান, আখ, ছোলা ও গমের ক্ষেত। মাঝে মাঝে বড় বড় জলা, বিল, সেখানে শালুক আর পানফল আর পানকৌড়ির ভিড়। কোথাও কোথাও বিস্তৃত আমবাগান, তাল আর সুপারির জঙ্গল, কোথাও বা নিম তেঁতুলের জটিল জটলা।

এটা পাখীর রাজ্য। এমন প্রশান্ত বিশ্রামের আসর সহসা চোখে পড়ে না। যতদূর দেখা যায় রৌদ্র কিরণে নিস্তব্ধ বনশ্রেণী, কোথাও কোথাও গ্রামের অস্পষ্ট চিহ্ন, আকাশের উজ্জ্বল নীলিমা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে খালবিলের জলে, শীতের বাতাসে মাঝে মাঝে উড়ে চলেছে নির্জন পথের ধুলো। এদেরই পারে-পারে ছায়া-শীতল গাছের ডালে নানা পাখীর অক্লান্ত কল-কোলাহল। শ্যামা, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, হাড়িয়াল, বকুলা, গাঙচিল, মাছরাঙা, নীলঘুঘু, দাঁড়কাক, বাবুই আর কাদাখোঁচা। কোথাও কোথাও বন-মুরগী, ছোট ছোট কালো হাঁস। মানুষের সাড়া পেলেই তারা জলের ভিতরে ডুব দেয়—তাদের খেলা বড় সুন্দর এ যেন দেশ-ভরা পাখী, পাখীর পৃথিবী,—তারা যেন প্রকৃতির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সংসর্গ পাতিয়ে জীবনের নিবিড় নেশায়

মশগুল। মানুষকে দেখে কুজন-গুঞ্জন থামিয়ে তারা অবাক চক্ষে চেয়ে থাকে। এরাই বোধ হয় নিষ্পাপ।

দাদু ছিলেন আমাদের লীডার। পরীক্ষায় দেখা গেছে বন্দুক হাতে দিলে তাঁর সর্বাঙ্গে পৌরুষ ছাপিয়ে ওঠে। বাঙ্গালী যুদ্ধপ্রিয় না হ'তে পারে কিন্তু যোদ্ধা নিশ্চয়ই। আমাদের সামাজিক জীবনে অস্ত্রের ঝনৎকার নেই, হিংসার স্থান নেই,—তার কারণ এমন নয় যে আমরা অকর্মণ্য ; কারণটা এই, আমরা দৈহিক শক্তির চেয়ে আত্মিক শক্তিকে বড় স্থান দিয়ে এসেছি। ভারতবর্ষের মধ্যে বহু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বহু সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য দেখা যায়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বাঙালীর সঙ্গে আর কোনো সম্প্রদায়ের বিবাদ নেই। বাঙালী কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বার্থবাদের জন্য অস্ত্র ধরে না, হানা-হানি করে না—তারা জানে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় যোগ্যতার দ্বারা, সেবার দ্বারা, জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার দ্বারা,—দৈহিক শক্তির দ্বারা নয়! বাঙালা দেশেই ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মানুষ অবারিত আশ্রয় পায়। তবু বাঙালী যখন অস্ত্র ধরে, তখন বুঝতে হবে দেশে ধর্মের গ্লানি দেখা দিয়েছে, অধার্মিক ও দুষ্কৃতকে বিনাশ না করলে সৃষ্টি রসাতলে যাবে! বাঙালী তখন অস্ত্র ধরে।

আমাদের সঙ্গী কিঙ্কর শ্যামলাল ব'লে উঠলো, বাবু, কবুতর্—

তেওয়ারী তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামালো। দাদু বন্দুকে কার্তুজ ভ'রে নিলেন। দিগন্তে সোনার রৌদ্রের মধ্যে একদল পায়রা তখন চক্রাকারে ঘুরছে। আমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে গাড়ী থেকে নামলাম। এটা শত্রু-বিনাশের আয়োজন নয়—নিরপরাধকে হত্যা ক'রে লক্ষ্য ভেদের অনুশীলন মাত্র!

হাতে আয়না থাকলে দেখতাম, হিংসার আনন্দ আমাদের মুখচোখে। শূন্যলোকে উড্ডীয়মান পাখীর বুকের ক্ষীণ স্পন্দনটুকুর প্রতিই আমাদের একাগ্র লক্ষ্য। উন্মত্ত আমরা হত্যার পিপাসায়। মনে হোলো, পক্ষীসমাজ স্তম্ভিত হয়ে আমাদের 'বীরত্ব' লক্ষ্য করছে। পায়রাগুলি ঘুরতে ঘুরতে এক মাঠে নেমে শস্যের দানা খুঁটে খেতে লাগলো। আকাশের নীলের আভাস তাদের পাখায়, চোখে অরণ্যের রহস্যময় ভাষা,—প্রাণবেগে চঞ্চল, সুন্দর। বন্দুক হাতে নিয়ে তাদের লক্ষ্য ক'রে দাদু ধীরে ধীরে গোপনে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

এরই নাম কি শিকার ? এই আত্মগোপন, এই ষড়যন্ত্র, এই চৌর্যবৃত্তি—এদেরই ভিতর দিয়ে কি শিকারীরা চলে তাদের শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় দিতে ? অসতর্কের প্রতি অতর্কিত আক্রমণকে কি শিকার বল্‌ব ? দুর্বলকে কৌশলে সংহার করার নাম কি যুদ্ধ ?

গুড়ুম !

ভয়ার্ত পারাবতের দল ডানার ঝাপটের শব্দে নানাদিকে উড়ে পালালো। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দুই তিনটা পাখীর ওলট পালট খাওয়ার মর্মান্তিক দৃশ্য। আমাদের শ্যামলাল গিয়ে তিনটি মৃতপ্রায় পায়রাকে তুলে আনল। নরম পালকের উপরে রক্তের দাগ,—বুকের স্পন্দন দ্রুত, অস্থির—ডানায় শক্তি নেই, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে করুণ ক্ষুদ্র দুটি চোখে শেষ মিনতি,—তাদের সমস্ত জীবনকাহিনী চক্ষুর পলকে স্তব্ধ হয়ে গেল !

নিরীহ হাবসীদের নিশ্চিন্ত কুটীর প্রাঙ্গণে ফাসিস্টারা কি এমনি করেই প্রবেশ করেছিল ?—তবে কি এই কথাই মনে রাখতে হবে যারা সংহার করতে জানে তাদেরই হাতে মানুষের উত্থান পতন ? হয়ত তাই। হিংসাই প্রকৃতির আদিম তত্ত্ব ! সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টার পরম হিংসার আয়োজন ! জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়ত মৃত্যুরই উপরে। তাই দেখা যায় বিশ্বব্যাপী সংহার লীলা,—তার সেই অবিশ্রান্ত বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ক্ষণিক পরমায়ুর আশ্রয়ে নীড়। আমরা হত্যা করতে আসিনি, তারাই এসেছে হত হবার জন্য। একটা অদ্ভুত নিয়ম আর নীতির আঘাতেই তারা মরেছে।

উপরে নীল আকাশ তেমনি সূর্যকিরণে ঝলোমলো, গাছপালা তেমনি ছায়া ও রৌদ্রে সুনিবিড়, বাতাস তেমনি সুন্দর ও স্নিগ্ধ, খালের জল তেমনি চলেছে ঝরঝরিয়ে। কিন্তু পাখীর রাজ্যে একেবারে নিঃসাড়, তাদের অবিরাম কল-কোলাহল এবার স্তব্ধ,—আমরা যেন এই আনন্দময় প্রকৃতির বুকেও গুলিবদ্ধ করেছি, অব্যক্ত যন্ত্রণায় চারিদিক বিমূঢ়। মানুষ তাদের কাছে আনলো বিভীষিকা।

চলো চলো, এগিয়ে চলো।—'যা আসে আসুক, যা হবার হোক, সত্যেরে লও সহজে।' হৃদয়াবেগ বারে বারে পথ রোধ করে, তাই শক্তির পরীক্ষায় বাঙালী শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়। কিন্তু শিকারের আনন্দটা অনেক বড়।

আমাদের দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নেই, সত্যকার হিংসার চেহারা আমরা জানিনে, প্রাণ নেবার ও দেবার সুযোগ আমাদের বড় অল্প,—তাই আজ রক্তের গন্ধে আমাদের ভিতরের বর্বর কিছু উত্তেজিত। বন্দুক ও কামান নামক মারণাস্ত্র যে আছে এ গল্প আমরা সংবাদপত্রের মারফৎ পাই,—আমাদের জাতীয় অস্ত্র এখন নখর ও দন্ত, সেই জন্য যুদ্ধ বাধে না, দাঙ্গা বাধে; শত্রুরা মরে না, হাসপাতালে যায় মাত্র! আমাদের দেশে হিংসা কণামাত্রও নেই, কিন্তু ঈর্ষা আছে পুরো-মাত্রায়।

বেলা গড়িয়ে এসেছে। খালের পথ দিয়ে চলতে চলতে এক এক জায়গায় লক্‌গেট পার হলাম। মোটরের শব্দ পেয়ে এক সময় ওপারের গ্রামের একদল বালক বালিকা ছুটতে ছুটতে এলো। শ্যামলাল প্রস্তাব করলো, এই গ্রামের ধারে ক্ষেতের ভিতরে একটা 'তালাও' আছে, সেইখানে পাতিহাঁস পাওয়া যায়। আজ রাত্রে সে আমাদের পাতিহাঁস রেঁধে খাওয়াবে। পায়রার চেয়ে হাঁস সুস্বাদু,—আমরা রাজী হয়ে পথের ধারে গাড়ী থামালাম।

মাঠের পথ পার হয়ে, ক্ষেতের আ'লের উপর দিয়ে নালা ডিঙিয়ে 'তালাও' খুঁজে বার করলাম। আমাদের হাতে সময় অল্প: জাহানাবাদ যাবো, গয়া যাবো—সেই পথ দিয়ে যাবো বাঘের জঙ্গলে! আকাশে আলো ম্লান হয়ে আসছে, সুতরাং অল্পক্ষণ খোঁজাখোঁজি ক'রে আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে চললাম।

উঁচু নীচু ধানের ক্ষেত, আখের চাষ, ভাঙাচোরা আ'লের পথ,—দাদুর পিছনে পিছনে আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম। মাঝে একটা তালের জঙ্গল। সহসা চোখে পড়লো গাছের আগডালে একজোড়া নীল ঘুঘু।

আমরা উপর দিকে তাকাতেই একটা ঘুঘু উ'ড়ে পালালো আর একটা রইল ব'সে। চুপি চুপি দাদু বন্দুক তুলে একাগ্র লক্ষ্য করলেন। লক্ষ্য তাঁর অব্যর্থ, গুড়ুম করে আওয়াজ করলেন, পর মুহূর্তেই ঘুঘু পাখী ঝটাপটি করতে করতে পড়লো ধানের শীষ বিছানো মাঠের উপর। আমি কখনো শিকার ধরিনে, আজ কেমন যেন উন্মত্ত উত্তেজনায় গিয়ে আহত ঘুঘুকে তুলে ধরলাম! আশ্চর্য, এখনো মরেনি, পাখার একধারে গুলি লেগে পাখার

দাঁড়াটা মাত্র ভেঙে গেছে। হাতের মধ্যে তাকে নিলাম,—আমার আঙুলের যত্নে, আমার স্নেহের আশ্রয়ে। মৃত্যুর ছায়া এখনো তার উপরে পড়েনি, এখনো সে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ; চক্ষু সতেজ, সজাগ,—এখনো সেই দুটি নয়নে অবারিত আকাশের মুক্তির মায়া, ক্ষুদ্র দেহটি জুড়ে জীবনের উত্তাপ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, অসহায় ভয়ার্ত বুকের স্পন্দন আমার হাতের মধ্যে দ্রুত ধুক ধুক করছে।

শিকারী যিনি তিনি এগিয়ে গেলেন, আমি চললাম সকলের পিছনে। ঘুঘুটা হাতের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আমার এক হাত রক্তাক্ত। ক্ষীণপ্রাণ দুর্বল পাখীটি এক একবার ব্যাকুলভাবে উড়ে পালাবার চেষ্টা ক'রে আবার যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। তার মুক্তি আর নেই, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী,—সে পড়েছে 'সভ্য' মানুষের হাতে। তার রক্ত কোমল লাল, পালকের রঙ নীল-সোনালী, পাগুলি মখমলের মতো নধর ডানা দুটি সবুজ। বিচিত্র তার রূপ। এই রূপের প্রতি আমাদের মোহ নেই, এটা বাহ্যিক, অনাবশ্যক, এর ভিতরে যে স্থূল মাংসস্তর সাজানো, আমাদের বর্বর লালসা সেইটুকু মাংসের প্রতি একাগ্র।

আবার চেষ্টা করছে উ'ড়ে পালাবার ; এর সর্বশরীরে কোথায় যেন একটা অসহ্য বেদনা মাথা কুটোকুটি করছে, তার থেকে এ মুক্তি চায়। ধকধক করছে ওর বুকের ভিতরটা, কাঁপছে ওর শরীর, চোখ মাঝে মাঝে বুজে আসছে,—আমার হাত কাঁপছে ওর যন্ত্রণা অনুভব ক'রে।

নারীর হৃদয় আর পুরুষের নিষ্ঠুরতার দ্বন্দ্ব চলেছে আমার মনে মনে। এটা য়্যাড্‌ভেন্‌চার নয়—এর মধ্যে শক্তি নেই, হাতের মুঠোর চাপে যার মৃত্যু ঘটতে পারে বন্দুক দিয়ে তাকে হত্যা করায় না আছে বীরত্ব না আছে মনুষ্যত্ব। তবু এই আমাদের শিকারযাত্রার ভূমিকা, অরণ্যপথের মুখবন্ধ। মৃত্যুর চিহ্ন এঁকে এঁকে যাবো বড় বড় জানোয়ারের জঙ্গলে, রক্তলেখাঙ্কিত পদচিহ্ন পড়বে জনপদের পথে পথে। ঘুঘুর রক্তে আজ সেই শোণিত উৎসবের উদ্বোধন।

ওকে নিয়ে চলেছি মাঠ পার হয়ে। বন্ধুবান্ধবেরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় মশগুল। কিন্তু একি হলো ? এমন হৃদয়দৌর্বল্য কেন হিংসার

পথে? যাকে হত্যা করেই আনন্দ তার প্রতি কেন এই অযৌক্তিক সহানুভূতি, কেন এই অশোভন মেয়েলিপনা? যাকে আঘাত করি, যাকে উচ্ছেদ করতে চাই, তার নিঃশব্দ সহনশীলতায় অপমান বোধ করি কেন? এমন কথা কেন মনে হয় যে আমি অপরাধী, আমি অন্যায় করেছি? ঘুঘুর চোখের ভিতরে চেয়ে দেখতে আমরা লজ্জা হচ্ছে, ওর দৃষ্টির ভিতরে যেন আমার প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ, অদ্ভুত মার্জনা, অপরিমেয় কৃপা। ওর নিজের যন্ত্রণা ছাপিয়ে যেন আমারই জন্য ওর বেদনাবোধ। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হোলো।

আবার অধীর যন্ত্রণায় সে মুক্তি নিতে চাইল, কিন্তু শক্ত ক'রে ধরে ছিলাম, পালাতে সে পারলো না। একটা ডানা তার অকর্মণ্য, ছেড়ে দিলে যে কোন জানোয়ার তাকে হত্যা ক'রে ফেলবে। সন্ত্রাসে ভীত, আঘাতে আতুর, দস্যুর মুষ্টির মধ্যে নিরুপায়,—কিন্তু এই সুন্দর পাখীর দেহের মধ্যে জীবনের মধ্যে জীবনের কি গভীর উত্তাপ, কি উজ্জ্বল প্রাণ, কী অপূর্ব রূপ।

হঠাৎ আমার হাতখানা তার শরীরের অস্বাভাবিক উত্তাপে জ্বালা ক'রে উঠলো। ভয়ানক উত্তপ্ত, যেন অগ্নিকুণ্ডের আভার মতো। কয়েকটি মুহূর্ত,—আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র—তারপর আমি যা কখনো কল্পনা করতে পারিনি,—সেই ঘুঘু আমার হাতের উপর একটি ডিম প্রসব করলো! সে কেবলমাত্র পাখী নয়, সে মা।

চীৎকার করে ডাকলুম, দাদু?

সবাই এলেন। উত্তপ্ত ডিমটা আমার হাত থেকে মাঠের উপরে পড়ে ভেঙে গেল। পাখীটা নিস্তেজ হয়ে গেছে এবার, আর যেন তার যন্ত্রণা নেই, অশান্তি নেই। তার মুক্তি হোলো, অর্থাৎ দেহ অসাড় হয়ে তা'র মৃত্যু হোলো।

উপরে অপরাহ্ণ তখন মলিন। শূন্য মন, শিকারের প্রতি যেন আর আসক্তি নেই, য়্যাড্‌ভেন্‌চারের প্রতি মোহ নেই। সকলে গাড়ীতে এসে উঠলাম।

গাড়ী ছুটলো। একথা জানি, অরণ্যপথে যাত্রা করেছি, শিকার করতে

চলেছি, মায়া-মমতার ধার ধারলে চলবে না। তবু যেন মনে হতে লাগলো এই যাত্রার প্রথম দিনেই যাকে আমরা হত্যা ক'রে চললাম সেটি কেবলমাত্র ঘুঘু নয়,—সে একটি সন্তানের জননী! কেমন যেন একটা মাতৃহত্যা হয়ে গেল!

*

* *

প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ঘুঘুপাখীটা জানিয়ে গেল, দুর্বলকে কৌশলে সংহার করা বলবানের পুরুষত্ব নয়। যারা ক্ষীণপ্রাণ, যারা ভয়ভীরু, তাদের বাঁচার পথে বাধা ঘটিয়ো না, তাদের আশ্রয় দাও, অস্তিত্বের অধিকার দাও।

মৃত্যুম্লান ঘুঘুপাখীর অসাড় দেহের দিকে তাকিয়ে কান পেতে আমরা এই উপদেশ শুনলাম। উপদেশ, উপদেশ মাত্র, কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি সৎ ও অসতের বন্ধন ডিঙিয়ে আপন স্বভাবধর্মের দিকে ছুটেছে। আমরা শিকারীর দল, হৃদয় আমাদের নেই। দুর্বার ভীষণ গতিতে আবার চলেছি হত্যার আনন্দে। বন্য স্বাধীন জীবন যারা যাপন করে, যারা আকাশে ওড়ে, অরণ্যের রহস্যে বিচরণ ক'রে বেড়ায়, যাদের মৃত্যুতে মানুষের সমাজে কোনো ব্যথা লাগে না, বলবানের অত্যাচারের প্রতিবাদ যারা কোন দিন জানাবে না,—তাদেরই বুকের রক্ত নিয়ে দুরন্ত উল্লাসে আমরা মাতামাতি করব। আমরা শিকারী, পথে পথে আমরা হত্যার চিহ্ন রেখে যাবো।

দিন দুয়েকের মধ্যেই ঘুঘুপাখীটার করুণ স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে এলো। তার রঙীন পালক, তার সুন্দর মুণ্ড, তার নানা রঙের ডানা, সর্বাঙ্গের লাবণ্য—ছুরি দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে জঞ্জালে ফেলে দিয়েছি; ভিতরের কচি মাংসটুকু রেঁধে রেখেছি। হজমও হয়ে গেছে। ঘুঘু এখন স্বর্গে।

সেদিন দুপুরে আবার মহাসমারোহে আমাদের যাত্রা শুরু হোলো। এবার সঙ্গে আছেন হারু আর কালু। দুজনেই উৎসাহী যুবক, দাদু ও বৌদিদির বিশেষ প্রীতিভাজন। আহারাদির প্রচুর আয়োজন সঙ্গে নিয়ে শীতের দুপুরে আমাদের আট-সিলিণ্ডার ফোর্ড-কার্ নক্ষত্র বেগে ছুটলো।

দুইধারে শস্যময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর, গাছে গাছে পাখীর কলকণ্ঠ, দূর-দূরান্তরে ছোট গ্রাম,—আকাশ আর পৃথিবীর দুইখানি নিস্তব্ধ মুখ যেন পরস্পরের

দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে, চোখে তাদের তন্দ্রা নেমেছে। আমাদের গাড়ী কখনও কখনও পঞ্চাশ মাইল স্পীডে চলছে,—আমাদের মন, আমাদের চিন্তার চেয়েও সে দ্রুতগামী। রৌদ্রের উত্তাপে জড়ানো শীতল শীতের হাওয়া বড়ো মধুর লাগছে। গাড়ীর ভিতরে নধর গদির মধ্যে আমরা সবাই ডুবে ব'সে আছি। মোটরের কোনো শব্দ নেই, বন্যজন্তুর মতো বিদ্যুৎগতিতে সে যেন ছুটেছে। বলা বাহুল্য, আমাদের তেওয়ারীই গাড়ী চালাচ্ছে। এই গাড়ীতে আমরা সমগ্র বিহার প্রদেশ তন্ন তন্ন ক'রে ভ্রমণ করেছি।

দানাপুর এলো। দক্ষিণে ষ্টেশন রেখে বাঁদিকে আমাদের গাড়ী ঘুরলো। পাশে পুলিশ লাইন, গোরা ছাউনী,—দেশী সৈন্যের কুচকাওয়াজ চলছে! আশপাশে কয়েকটি দোকান, ছোট একটা বাজার। শহর বড় নয়। পাথুরে রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের গাড়ী চললো। পথের দুইদিকে দরিদ্র গ্রাম, শুষ্ক ধূলিধূসর পথের ধারে গ্রামের উলঙ্গ বালক বালিকা মোটর গাড়ী দেখে ছুটে এলো। মাঠে মাঠে আখের ও ডালের চাষ, কোথাও কোথাও বিলের জলে স্ত্রী-পুরুষে পানিফল তুলছে। আবার ডানদিকে সঙ্কীর্ণ পথে আমাদের গাড়ী বাঁক নিল! উঁচু নীচু, ভাঙাচোরা, এলোমেলো রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হেলতে দুলতে গাড়ী টাল খেয়ে খেয়ে চলেছে। একসময় ঢালু দিয়ে নামতে নামতে আমরা হঠাৎ এক মাঠে নামলাম। শোনা গেল বর্ষাকালে এই মাঠে নদী বয়, এটা নদী। বালুতে একসময় গাড়ীর চাকা আটকাতেই আমাদেরও সে কথা মনে হলো। গ্রামের লোক যান-বাহন দেখলেই তাদের সতর্ক ক'রে দেয়, চোরা বালিতে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। কিন্তু বিপদ আমাদের নেই, আমরা শিকারী। তেওয়ারী পথ চেনে, নদী অতিক্রম ক'রে মাঠের উপর দিয়ে গাড়ী চালাতে লাগলো। অতি সঙ্কীর্ণ উঁচু-নীচু মৃত্তিকাময় পথ। মাটির রং ঈষৎ হরিদ্রাভ। এদিকে কোনো গ্রাম নেই,—কচিৎ এক একটি কৃষকের কুটীর। চারি দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল অড়হর ও বুটের ক্ষেত, যেন সবুজের প্লাবন, অগণ্য অপরিমেয় ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। মাঠের পথ, খানা-খোপরায় গাড়ী হেলে দুলে চলছে।

সবসুদ্ধ প্রায় একুশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে নদীর তীরে এসে গাড়ী

দাঁড়ালো। শোন্ নদী। তীরে কতকগুলি মহাজনী নৌকা বাঁধা। আজ পূর্ণিমা তিথি, রাত্রি দশটায় চন্দ্রগ্রহণ লাগবে। দূর দূরান্তর থেকে পুণ্যকামী স্নানার্থী নরনারী এরই মধ্যে ঘাটে ঘাটে এসে ভিড় করেছে। কোথাও কোথাও পূজাপাঠ শুরু হয়েছে, কোথাও হোগলার চালা বেঁধে যাত্রীরা বিশ্রাম নিচ্ছে। বর্ষাকালের মতো নদীতে খরস্রোত নেই; দূরে দূরে নদীর মাঝে মাঝে চর জেগে উঠেছে। আজ আমরা নদীতে শিকার করবো।

তেওয়ারির জিম্মায় গাড়ী রইল। দাদু হাতে বন্দুক নিলেন, শ্যামলাল তাঁর পিছু-পিছু ঘাটের কিনারা দিয়ে চলতে লাগলো। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদিদি চললেন। এর আগে আর একবার তাঁরা সবাই এই নদীতে পাখী-শিকার করতে এসেছিলেন। পথঘাট তাঁদের চেনা।

ঘাটে নেমে বড় একখানা নৌকা ভাড়া করা হলো। কালুবাবু জোয়ান ব্যক্তি, সবাইকে হাত ধরে তুলে নিলেন! দাদুর চক্ষু ছিল নদীর চরে-চরে। নৌকা ছেড়ে দিল। জিনিসপত্র ও আহারের আয়োজন ছিল প্রচুর, নৌকোর ভিতরে আমাদের জন্য একটি ছোটখাটো সংসার রচনা করা হলো। আমার কাছে ছিল কার্তুজের থলি, নম্বর দেখে দেখে দাদুর হাতে জুগিয়ে দিলাম। নৌকা চলল পশ্চিম দিকে। রৌদ্র এবার একটু প্রখর মনে হচ্ছে।

পাখী—পাখী—স্নাইপ্—

অকস্মাৎ আমরা সবাই নির্বাক ও নিশ্চল হ'য়ে গেলাম। নৌকার মাঝি-মল্লা সজাগ। পশ্চিমের একটা চরে প্রায় এক শত স্নাইপ্ জলের ধারে বিশ্রাম করছে। কেউ কারো গায়ে ঠোঁট ঘষছে, কেউ বা বালুর উপরে বুক পেতে বসে আপন আপন দুর্বোধ্য ভাষায় বিশ্রম্ভালাপ করছে। কালো কালো সরু ধারালো ঠোঁট, চোখগুলি কালো, দেহ শাদা, পাগুলি পাঁশুটে! কেউ বললে, স্নাইপ্—কেউ বললে আর কিছু। সকল পাখীকে আমরা চিনিনে।

দাদু বললেন, মারবো নাকি হে?

বললাম, খাওয়া যাবে ত?

আরে বলো কি, চমৎকার মাংস!

অতি সন্তর্পণে নৌকা চলেছে সেই দিকে। প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে,—

পাখীরা এখনো জানতে পারেনি, নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় নদীর কোলে আত্ম-গোপন ক'রে রয়েছে। তাদের বিশ্বাস তাদের কোনো শত্রু নেই!

গুড়ুম!

অব্যর্থ লক্ষ্য। নীল আকাশে যেন বজ্রাঘাত। মুহূর্তে অতগুলি পাখী দ্রুতবেগে উড়ে পালালো নদীর উপর দিয়ে। কিন্তু ওকি, উড়ন্ত একটা পাখী ঝাঁপিয়ে আবার পড়েছে জলে। আশ্চর্য, চরের উপরে আরো যে দুটো পাখী! ওরা কি নিদ্রিত, ওরা কি শুনতে পায়নি বন্দুকের আওয়াজ, ওরা কি আকাশ আর নদীর স্বপ্নে বিভোর? নৌকা ছুটলো সেইদিকে। জলের উপর থেকে আহত পাখীকে ধ'রে নেওয়া হোলো, তারপর শ্যামলাল গিয়ে নামল চরে, দেখা গেল দুইটি পাখী মারা পড়েছে। আজ আমাদের প্রথম লক্ষ্য সার্থক। মাথার উপরে চেয়ে দেখি, সেই স্নাইপের দল শূন্যে উড়তে উড়তে তীব্রকণ্ঠে মৃত্যুর বার্তা ঘোষণা ক'রে চলেছে। তাদের রাজ্য আজ দস্যুতে করেছে আক্রমণ, তাদের শান্তিভঙ্গ হয়েছে,—মৃত্যু এসে দিয়েছে হানা। কিছুক্ষণ এইভাবে গেল। তারপর দুর্বলের ব্যর্থ আর্তনাদ ক্ষীণ হয়ে এলো তারা প্রতিবাদ জানায়, প্রতিকার করতে পারে না,—পরাধীন জাতির মতো।

তিনটি মরা পাখী এনে নৌকার ভিতরে রাখা হোলো। এখনো তারা মলিন হয়নি, রক্ত এখনো তরল, হয়ত মজ্জায় মজ্জায় এখনো চাঞ্চল্যের ক্ষীণধারা বইছে। কিন্তু আমাদের শিরার রক্তও এবার অধীর হয়ে উঠেছে। দ্রুতবেগে নৌকা ভাসিয়ে পুবদিকে পাড়ি দিলাম। হত্যার নেশায় আমরা বিভোর। আমাদের দেশে যুদ্ধ নেই, বিপ্লব নেই, স্বাধীনতা নেই, পুরুষত্বের পরিতৃপ্তি আমরা পাইনে, বীরত্ব প্রকাশের সুবিধা আমাদের নেই, দেহ ও মনের শক্তি প্রকাশের পথ অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরুদ্ধ,—আজ তাই পাখীর রাজ্য আক্রমণ ক'রে আমরা শক্তিক্ষয় করতে চলেছি। আজ অসংখ্য প্রাণী বধ ক'রে আমরা ক্ষুধা মেটাবো। দাদুর চোখে মুখে এবার অসীম পরাক্রম ফুটে উঠেছে।

তীরের কোলাহল আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, অনেক নৌকা এসে পড়েছে। চারিদিকে এবার নদীর জল আর বিস্তীর্ণ চরভূমি। নদীর সঙ্গমের

কাছাকাছি এসে পড়েছি। এখানে শোন্, সরয, আর সরস্বতী এসে মিলেছে। দূরান্তরে নীল তটরেখা—পাটনা, বালিয়া, ছাপরা ও আরার এইটি সংযোগ-স্থল : নদীর সঙ্গে নদী মিলেছে, একটার সঙ্গে আর একটার খেই হারিয়ে ফেলেছি। শোন্ নদীর অপর পারের দিকে নৌকা এসেছে। আঃ, কী সুন্দর পাখীর দল! শত শত, সহস্র, নানারঙের, নানা আকৃতির। নির্জন নদীর চরে প্রকৃতির গানের আসরে ওরা যেন নিমন্ত্রণে বসেছে। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, নদী আর প্রান্তর, মানুষের চিহ্ন কোথাও নেই। আকাশের সুন্দর সূর্যকিরণ, শীতের মধুর স্নিগ্ধ বাতাস, জলের উপরে লক্ষ্য মণি-মাণিক্য জ্বলছে,—জল-কল্লোলের সঙ্গে অগণ্য পাখীর কলরব—যেন নদীর কোনো গভীর রহস্য-লোকে আমাদের আকর্ষণ ক'রে নিয়ে চলেছে। মাঝিরা দাঁড় ছেড়ে দিয়ে নিস্তব্ধ ও নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়ালো। ওগুলি কী পাখী? ওরা যেন সন্দেহ ক'রে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মানুষের গন্ধ পেয়ে ওরা সতর্ক হয়ে ধীরে ধীরে ডানা মেলছে। শত শত পাখী, সহস্র, অগণ্য! আমাদের মুখে কথা নেই, শব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, রুদ্ধনিশ্বাসে আমরা যোগ-সাধনায় ব'সে গেছি।

গুড়ুম !!

মুহূর্তে মৃত্যু ছুটে গিয়ে তাদের আঘাত করলো। তাদের দল ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল। প্রাচীন মুনিগণের আশ্রমে যেন রাক্ষসের উৎপাত। পাখীর দল দূর শূন্যের দিকে কোলাহল ক'রে উড়ে পালালো; নদীর উপর দিয়ে, দেশ-দেশান্তর, কোন্ রাজার দেশে, কোন্ সাগরের কূলে—শত শত, সহস্র পাখী। সুন্দর তাদের গতি, তাদের ডানার ঝাপট, তাদের বিচিত্র পক্ষসঞ্চালন!

শ্যামলাল হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো, হুজুর একঠো গির্ পড়া—হাঁস হ্যায় হুজুর, হাঁস—

আনন্দে অধীর আমরা নৌকা নিয়ে ছুটলাম তীর-ভূমির দিকে। একটা হাঁস উড়তে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়েছে। আমাদের নির্দয় ব্যবহারে সে যেন হতচকিত। মৃত্যু তাকে ছুঁয়েছে, তার আর উত্থান শক্তি নেই। তীরে গিয়ে নৌকা থেকে নেমে শ্যামলাল তাকে ধরলো। ছোটবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না, দেহের কোন্ সন্ধিস্থানে তার গুলী লেগেছে, সে একেবারে

অকর্মণ্য, কিন্তু জীবন্ত। চমৎকার পাতিহাঁস, রঙীন নখর পাগুলি রাঙা, সংযুক্ত ; চোখে কাজল, পিঠে রঙের অলঙ্কার, ঠোঁট দুটি চেপ্টা, রাঙা। প্রাণের বেগে সে দুরন্ত। মানুষের হাতের ভিতরে এসে আরও অধীর হয়ে উঠলো। জীবনে সে হয়ত মানুষের কাছে আসেনি। আকাশে তার বাসা, সাগরে প্রান্তরে নদীর কিনারায় তার লীলাক্ষেত্র, কোন নির্জন পর্বতচূড়ায় হয়ত তার বৃদ্ধ পিতামাতা সন্তানের আশায় ক্ষুধার্ত হয়ে পথ চেয়ে রয়েছে।

আমরা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলাম, তার আর পালাবার সাধ্য নেই। তার সুন্দর কচি মাংসের দিকে সকলের লোলুপ দৃষ্টি !

নৌকা ঘুরলো পশ্চিম দিকে। দূরে দেখা গেল, এক চরভূমিতে একান্ত নির্জনে দুটি গৈরিক রঙের পাখী পাশাপাশি ব'সে রয়েছে, একটি আর একটির গায়ে ঠোঁট বুলোচ্ছে। ওদের দেখতে পেয়ে আমাদের সকলের আনন্দ, ওদের নাম চক্রবাক। ওরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে না, জোড়ায় জোড়ায় নদীর নির্জনে ঘুরে বেড়ায়। চক্রবাক শিকার করা বড় কঠিন, ওরা বড় সতর্ক, বহুদূর থেকে ওরা শত্রুর আগমন উপলব্ধি করতে পারে। নৌকা দেখলে পালায়, মানুষের আভাস পেলেই উড়ে যায়। ওদের গলার স্বর কর্কশ, হাঁসের চেয়ে রূঢ় ও দীর্ঘ। পুরুষ-পাখীটি চীৎকার করতে থাকে, মেয়ে-পাখী সতর্ক হয়ে যায়। ওরা চতুর ও সন্দিগ্ধ। বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে ওদের পাওয়া বড় সমস্যার কথা। অভিজ্ঞ শিকারী ছাড়া চক্রবাক মারা যায় না।

নৌকা চলছে ধীরে ধীরে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলেছেন। জল ছল ছল করছে,—নিস্তরঙ্গ, প্রশান্ত। বাতাস নেমে গেছে। পারে যাবার টান্ নেই ; এমনকি নৌকার মধ্যে রাত্রিবাস করবার উপকরণও সঙ্গে রয়েছে। বৌদিদি তাঁর চিরাভ্যাসমতো সেবা ও যত্নের আয়োজনে ব্যস্ত। তিনি ষ্টোভ জ্বেলে জলযোগের আয়োজন করছেন। কালুবাবু পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় গল্প রচনা ক'রে মাতিয়ে রেখেছেন। তিনি চপলতায় মুখর।

চরের কাছাকাছি এসে নৌকা থামল। চুপি চুপি চোরের মতো সন্তর্পণে, নিতান্ত নিঃশব্দে দাদু ও শ্যামলাল নামলো। চক্রবাক দুটি দূরে আত্মবিস্মৃত হয়ে বসে রয়েছে, তারা টের পায়নি। নদীর চর জলে ও মাটিতে নরম, পা পুঁতে যায়। অনেকদূর ঘুরে শ্যামলালের আগে আগে দাদু চলেছেন,

পাখীদের সেদিকে লক্ষ্য নেই, তারা সতর্ক হয়নি। আমাদের চক্ষু উদ্‌গ্রীব, রুদ্ধ নিশ্বাস, অনেক পরিশ্রমে আজ আমরা চক্রবাক পাবো। এ পাখীর অনেক দাম। আমরা পাথরের মত নিশ্চল হয়ে রইলাম। ফিরে গিয়ে আজ আমরা উৎসব করব। দাদু বহুদূরে গিয়ে পড়েছেন, দেখা গেল শ্যামলালের হাত থেকে তিনি বন্দুক নিলেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত, এক, দুই, তিন, চার—

গুড়ুম!!

দুটি চক্রবাক ভীষণ বেগে চীৎকার ক'রে উড়ে গেল। আকাশে আকাশে তাদের কণ্ঠ গেল মিলিয়ে। নদীর উপর দিয়ে, চড় ডিঙিয়ে, প্রান্তর অতিক্রম ক'রে মাঠের পর মাঠ ঘুরে আমাদের মাথার উপরে,—দেখতে দেখতে কোথায় গেল তারা হারিয়ে মিলিয়ে অস্পষ্ট হ'য়ে। আ, খুশী হলাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, বাঁচলো তারা, তারা অমর হোক। একটির মৃত্যু ঘট্‌লে আর একটি জীবন অসহনীয় বেদনায় ভ'রে উঠতো, কেঁদে কেঁদে বেড়াতো নদীতে নদীতে। এই ভালই হোল।

শ্যামলালের সঙ্গে দাদু ফিরে এলেন। পা ধুয়ে নৌকায় উঠে বললেন, বন্দুক ভেঙে গেছে! আমরা সবাই সবিস্ময়ে দেখি, বন্দুকের ডানদিকের নলের মুখ বিদীর্ণ হয়ে গেছে গুলী তাই চক্রবাককে বিদ্ধ করতে পারেনি। ইস্পাতের নল ফেটে যাবার কারণ বোঝা গেল না। কি ভাগ্যি; দাদুর কোনো দুর্বিপাক ঘটেনি। ভাঙা বন্দুকে আর শিকার করা সম্ভব হবে না। গুলির তেজ কী ভীষণ; বন্দুক ভাঙলো।

বেলা প্রায় অবসান। রৌদ্র ঝিলমিল করছে; আকাশ বিবর্ণ হয়ে এসেছে। সূর্যের রাঙা রশ্মিতে শোন্ সরযূর জল ফিকে গোলাপের রঙ দেখাচ্ছে। এমন সময় বহুদূর থেকে আগেকার হংস বলাকা আকাশ-পথে আমাদের দিকে উড়ে আসছে দেখা গেল। অকর্মণ্য বন্দুক, তবু দাদু বাঁদিকের নলে গুলী ভরলেন। একটা গুলী অযথা খরচ হবে। কী সুন্দর, কী বিচিত্র হাঁসের দল, চক্রাকার পাখা, কলকণ্ঠে আকাশ পথ মুখর। পরস্পর যেন গল্প করতে করতে মেরুপ্রদেশের দিকে চলেছে! বুকের রক্ত তারা যেন চঞ্চল ক'রে চ'লে যায়: উন্মনা চক্ষু আর উদ্‌গ্রীব মনকে তারা যেন আপন ভাষায় ডাক দেয়, দেহের বন্ধন খুলে মুক্তি পিপাসু আত্মা যেন তাদের ডানার

তলে তলে ছুটতে থাকে। কে জানে কোন্ দিকে তারা যাবে,—সন্ধ্যা থেকে প্রভাতের দিকে, অন্ধকার পার হয়ে আলোকের পথে, পৃথিবী উত্তীর্ণ হয়ে স্বপ্ন-লোকে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে,—কে জানে কোন্ সুদূরে!

গুড়ুম !!!

যা, লণ্ডভণ্ড হোলো, বলাকা ছিন্নভিন্ন হোলো, চুরমার হয়ে গেল। মুহূর্ত পরে দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড উড়ন্ত পাখী শূন্যে ওলট-পালট খেতে খেতে নদীর উপর ঝপাৎ ক'রে পড়লো। ধন্য দাদুর লক্ষ্য, তাঁর ভাঙা বন্দুক অসাধ্য সাধন করেছে। ধন্য, ধন্য! অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য, এমন আর কোথাও শোনা যায় না। সার্থক আমাদের শিকার। আমার অধীর উল্লাসে নৌকা নিয়ে হাঁসের দিকে ছুটলাম।

হাঁস যে জীবিত! দিব্যি সে সাঁতার কেটে পালাচ্ছে। নৌকার তাড়নায় প্রাণপণে সে জলের উপর ভেসে ছুটছে। তাইত, ধরবো কেমন ক'রে? যদি পালায়? মাঝিমাল্লা সমস্ত শক্তি দিয়ে নৌকা ছুটিয়েছে। শ্যামলাল অধীর আনন্দে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। জল সেখানে অল্প, চরের কাছাকাছি, কিন্তু বেচারি শ্যামলাল কিছুদূর যেতে যেতে গভীর জলে গিয়ে পড়লো—সে আবার সাঁতার জানে না। আমরা চীৎকার ক'রে তাকে অগ্রসর হ'তে মানা করলাম। সে বেয়াকুব হ'য়ে চরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। ভারি বোকা বনে গেছে।

হাঁসের পিছু পিছু নৌকা ছুটছে। জীবন্ত হাঁস, প্রকাণ্ড হাঁস, তার শক্তি কম নয়। বন্দুকের গুলিতে তার ডানা ভেঙে গেছে, শরীরে কোথাও লাগেনি। সুতরাং ধরা সে কিছুতেই দেবে না। এর নাম **wild goose chasing,** অনেকক্ষণ আমাদের হায়রান ক'রে এক সময়ে হাঁস ওপারের ডাঙায় উঠে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলো। তৎক্ষণাৎ তীরে নৌকা ভিড়িয়ে হরিচরণকে পাঠালাম। সে দৌড়ল। এবার হাঁস যাবে কোথায়। হরিচরণ ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাকে কঁ্যাক্ ক'রে ধরে ফেললো। আনন্দে চীৎকারে করে সেখান থেকেই সে জানালো, হুজুর, বড়া ভারী শিকার হ্যায়, আড়হাই সের গোস্ত তো হোগা, কম্‌সে কম্।

আজকের শিকার সাঙ্গ হোল।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে পূর্ব্বগগণে। পশ্চিম আকাশে তখন সূর্যাস্তের রক্তিম সমারোহ। যেন মৃত্যুর চিতা জ্বলছে। আমরা নদীর উপর দিয়ে নৌকায় চলেছি। বাঁ-দিকে পূর্ণিমার চন্দ্র, মধ্যে উদার পৃথিবী, ডানদিকে গোলাকার প্রকাণ্ড সূর্য, উপরে অসীম আকাশ,—এদের ভিতর দিয়ে ফিরে চলেছি। মন ভারাক্রান্ত।

দেখতে দেখতে অন্ধকারে চারিদিক অস্পষ্ট হয়ে এলো, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাতেও সেই অন্ধকার ঘোচে না। মাঝে মাঝে পাখীর দল মাথার উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে, তাদের অসংখ্য ডানার ঝাপট ছাড়া আর কিছু বোঝা যায় না। একবার দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড পাখী একাকী চীৎকার করতে করতে একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি করছে, তার তীব্র কর্কশ কণ্ঠ যেন বেদনায় ভারাক্রান্ত। জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে তার ডানার ছায়া পড়ছে আমাদের নৌকায়। দাদু তার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ পরে বললেন, ওটা বোধ হয় আমাদের এই হাঁসটার সাথী! জুড়ী হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা—হাঁসেরাও চক্রবাকের সমগোত্র।

নদীর তীরে শাঁখ ঘণ্টা বাজতে শুরু হয়েছে, আলোর মালা জ্বলছে। যাত্রীদের কলরব শুনতে পাচ্ছি। আজ চন্দ্রগ্রহণ। মেয়েরা সম্মিলিত কণ্ঠে কোথায় যেন গান ধরেছে। কালুবাবু টর্চ জ্বালিয়ে তীরভূমির দিকে তেওয়ারিকে নিশানা দিলেন, তেওয়ারি ওপার থেকে গলার আওয়াজ দিল। দেখতে দেখতে আমাদের নৌকা তীরে এসে লাগলো। তেওয়ারি হর্ন দিল।

মাঝপথে আর কোন উল্লেখযোগ্য শিকারের উৎসব নেই। পথে পথে অনিয়মের বনভোজন, এলোমেলো চাল চলন, পথের ধারে মোটর থামিয়ে প্রাচীন বটের ছায়ায় বসে রবিঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি, কোথাও বা শ্যাওলা-শালুকে ভরা ছলছলে জলাশয়ের ধারে গা-এলানো বিশ্রম্ভালাপ। ছন্দটা আছে বটে, তবে চরণের সঙ্গে চরণের মিল নেই; সুরের টানা আছে কিন্তু সেটা অমিত্রাক্ষরের মতো কোথাও সরল কোথাও বা ঋজু। এমন বেপোরোয়া অনিয়ম আর রাশআলগা ভ্রমণের মাদকতা শিকারের নেশার চেয়ে কম নয়।

বাঁ দিকে ট্রেনের লাইনটা দৃশ্যমান দিগ্বলয়ের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘসূত্রীর মতো পড়ে রয়েছে। নিঃশব্দে পথ নির্দেশ করছে সন্দেহ নেই। এই পথটা পাটনা থেকে গয়া। প্রায় ষাট মাইল পথ। এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে গেলে জাহানাবাদ নামক জনপদ পড়ে। ছোট মহকুমার শহর। শহর বটে, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপকরণ-বাহুল্য কিছু নেই। ধুলোয় মলিন তার চেহারা, আমাদের পথের ধারে কুণ্ঠিত দারিদ্র্য নিয়ে দাঁড়িয়ে—সেই শীতের সন্ধ্যায় তার আতিথ্য গ্রহণ করতে হোলো। সারকুইট্ হাউসে আমরা আস্তানা নিলাম। তিনদিন সেখানে অবস্থান।

গয়া শহর ছেড়ে আমরা যখন দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলাম, অগ্রহায়ণের অপরাহ্ণ তখন মলিন হয়ে এসেছে। শহরের ঘন জটলায় ও বসতি-সন্নিবেশের ভিতরে শীতের প্রকোপ তেমনি বোঝা যায় না—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে দ্রুতগতি মোটরের ভিতরে ব'সে সহজেই জানা গেল বিহারের শীতের চেহারাটা কেমন।

প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ আমি ভ্রমণ করেছি; রেঙ্গুন থেকে দ্বারকা-পুরী, কন্যাকুমারিকা থেকে বদরিকাশ্রম ও কাশ্মীর সীমানা; তার দক্ষিণ পশ্চিম পথে আফ্রিদী রাজ্য। পরিব্রাজকের দুর্নামটা আমার আবাল্য। কিন্তু আজকের এই খেয়ালটা অতি আধুনিক. এই দুরন্তপনার জন্ম বছর চারেক। বন্দুক অথবা রাইফেল আমি ধরিনে, জীবহত্যা ক'রে বেড়ানো আমার লক্ষ্য নয়, তবুও শিকারের ভিতরে যে বন্য আনন্দ আর উগ্র উত্তেজনা রয়েছে আমার আকর্ষণটা সেই দিকে। চারিদিকে যে জীবন আমার পরিচিত, যে-জীবন কেবলমাত্র গৃহস্থালী আর লাভ-ক্ষতি টানাটানির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে ফুরিয়ে যায়, সেই জীবন থেকে মাঝে মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উল্কার মত শূন্যের দিকে ঠিক্‌রে পড়তে ভালো লাগে। এমন পথ এমন রাজ্য আমার ভালো লাগে যেখানে লোকালয়ের কোন বাঁধাধরা শাসন নেই, ঘর থেকে বেরিয়ে যেখানকার ঘরে গিয়ে আমাকে উঠতে হবে না, যেখানে সৌজন্য-সামাজিকতার পায়ের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে আমাকে 'ভদ্র' জীবন যাপন করতে হবে না। উচ্ছৃঙ্খল, দুর্বার, বন্য জীবন আমার বড় প্রিয়।

আমাদের মোটর ছুটছে! আট সিলিণ্ডার গাড়ী, নূতন, সুন্দর,

আরামদায়ক,—এ গাড়ী কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আমরা ছয়জন যাত্রী। চালকটি আমাদের বহু দুর্যোগের সঙ্গী, সেই পরিচিত তেওয়ারী। তেওয়ারীর পাশে বৌদিদি, তাঁর পাশে তাঁর স্বামী—আমাদের দাদু। আমি পিছনের সীটে রাজাসনে; বোধ করি বয়ঃকনিষ্ঠ এবং 'সম্মানিত অতিথি' বলেই আমার এই সৌভাগ্য। আমার পাশে একটি কৃষ্ণকায় হরিজন যুবক—সে অরণ্যবাসী। তার পাশে গয়ার উকিল নগেনবাবু—তাঁর দেহের স্থূলতায় আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, তিনি অতি অমায়িক মানুষ।

মোটর ছুটছে দ্রুতগতি। জানিনে কতদূর যাবো। এই লক্ষ্যহীন চলাটা বড় মধুর। পূর্ব দিকে দূরে বুদ্ধগয়ার বিশাল মন্দিরটি দেখতে পাচ্ছি, চারিদিকে অকূল প্রান্তর, আমাদের পথের দক্ষিণে বৃক্ষশ্রেণী। গাড়ীর ভিতরে আমাদের সাজ-সরঞ্জাম কম নয়। রাত্রি-ভোজনের আয়োজনটা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। শয্যার কোন বালাই নেই, কারণ সমস্ত রাত্রিই আমরা জঙ্গলের ভিতরে যাপন করবো। নগেনবাবুর হাতে রাইফেল্‌, দাদুর কাছে বন্দুক। বুলেট আর কার্তুজের থলিটা আমার জিম্মায়। এ কথা সর্ব-সম্মত যে আমি বন্দুক ধরবো না। শিকারযাত্রায় বৌদিদি সঙ্গে আছেন এটা অনেকের পক্ষেই বিস্ময়কর ঠেক্‌বে জানি, কিন্তু তিনি হিংসা ও অহিংসার অতীত; তাঁর চরিত্র উগ্রতাও যেমন নেই, সাহসটাও তেমন বহির্মুখী নয়, স্বামীর সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি চিরদিন জড়িত; স্বামীর সঙ্গে অনেক সময়েই তিনি শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে যান। গুলীর আওয়াজে তাঁর আর চমক লাগে না, মৃত জানোয়ারের দৃশ্যে তাঁর বিশেষ উত্তেজনাও দেখা যায় না। বৌদিদির সন্তানাদি হয়নি।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাছপালার পত্রবহুল শাখাপ্রশাখার ভিতরে ঘন হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে পথের ধারে একটি বস্তি থেকে একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে গাড়ীতে তুলে নিয়েছি। মানুষটা কালো, সংযতবাক্‌। পরনে খাটো খদ্দরের জামাকাপড়; হাতে একগাছা লাঠি। যাঁরা শিকারে আসেন এমন অনেক রাজা ও ধনী ব্যক্তিগণের সে দক্ষিণ হস্ত। তার সকলের চেয়ে বড় গুণ যে, সে অরণ্যের গভীর অন্ধকারেও জন্তুর অস্তিত্ব বুঝতে

পারে, জানোয়ার খুঁজে বার করতে তার আর জুড়ি নেই। স্পট্‌লাইট্‌ ফেলতে সে একজন বড় ওস্তাদ। কিন্তু তার আসল পরিচয় এই যে অরণ্যের পথের সকল রহস্য তার করতলগত, সে আমাদের পথ চেনাবে ; আমরা হারিয়ে না যাই। বস্তুত হারিয়ে যাওয়াটাই জঙ্গলের বড় বিপদ। পথগুলো গোলোক ধাঁধা। জন্তুর আকর্ষণে প্রথম দিকে থাকে উৎসাহ আর উদ্দীপনা, মনটা চলে শিকারের পথ ধরে, তখন বেপোরোয়া অগ্রগতি ; তারপর দেখা দেয় পথের সমস্যা—রাত্রে উত্তর দক্ষিণের কোনো নির্দেশ নেই, মাথায় উপরে থাকে নক্ষত্রখচিত অবারিত দিগন্তজোড়া আকাশ, তার নীচে চারিদিক জুড়ে ঘন অরণ্যের প্রাচীর। পায়ে চলার শত শত পথের চিহ্ন নীচে দেখা যায় ; কিন্তু তখন নিজের হিসাব সম্বন্ধে বিশ্বাস যায় হারিয়ে, সন্ধানী মন আকুল হয়ে ওঠে—সেই সময়ে ঘটে বিপদ। দিনের বেলাও তাই, সূর্যালোক সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে অরণ্যের জটলার ভিতর দিয়ে, দিশাহারা চক্ষু দিক-নির্ণয় করতে পারে না ; এমন চিহ্ন কোথাও কিছু নেই যার ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রে পথ আবিষ্কার করবো! এই বিপদে পড়ে আজ পর্যন্ত অনেক প্রাণ নষ্ট হয়েছে।

মোটর ছুটছে। মনটা কিছু চড়া সুরে বাঁধা। বন্দুক ধরাটা আমাদের সাধারণ জীবনে অভ্যাস নেই, অথচ ওর একটা উগ্র মাদকতা আছে। আমরা পরপদানত জাতি, স্বাধীন মানুষের মতো বীরত্ব ও আত্মপ্রকাশ আমাদের নেই, জীবনকে দিক্‌বিদিকে প্রসারিত ক'রে অসীম সাহসের দিকে অভিসার করবার সুবিধার অভাব, নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে কেবলমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নিয়ে ঘুরলেও আমরা রাজরোষে পড়ি। দুঃসাহসের পথযাত্রায় যদি দেশান্তরে পাড়ি জমাই তবে তার জন্য রাজদরবারে সম্মতি ভিক্ষা করতে হয়। মনে পড়ে বছর দশেক আগে করাচী থেকে বোম্বায়ের দিকে আরব সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন জাহাজে চলেছি, সেই সময় অকারণে আমার গতিবিধির উপর দুইটি গোয়েন্দা নজর রেখেছিল ; একথা তারা বোধ হয় জানতো না যে যদিবা দুর্নীতি কিছু করি, কিন্তু রাজনীতি আমি জীবনে করিনি। মনে পড়ে পেশোয়ারের পথেও একদিন ভোর রাত্রে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। আমার অপরাধ এই যে, আমি 'সাইমন্‌ কমিশনের' যাত্রাপথে

প'ড়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত এক পাঞ্জাবী গোয়েন্দার সঙ্গে হাতাহাতি ক'রে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়।

কাহুডাগ ডাকবাংলা আসতে আর দেরি নেই। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনেও কিছু ত্রাসের সঞ্চার হচ্ছে। বাঘের জঙ্গলে প্রবেশ আমার জীবনে এই প্রথম অভিজ্ঞতা। সেখানে কী আছে কী নেই একথা কে জানে? কিছুকাল জলা, বিল, দীঘির ধার, নদীর চর—এইসব জায়গায় শিকারীদের সঙ্গে ঘুরেছি; বর্মামুলুকের থিঙাইয়াংঙের পথ ধ'রে দিনের বেলায় একলা জঙ্গলের এক অংশ দেখেছিলাম—কিন্তু আজ একটা অদ্ভুত ভয়-জড়ানো উল্লাস আমার শিরার মধ্যে ছুটোছুটি করছে। কেমন যেন নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করছি আপন অস্তিত্বকে। যুদ্ধের স্বাদ আমাদের জানা নেই, প্রাণীর প্রাণকে কেমন দুর্বার শক্তিতে সংহার করতে হয়, উন্মত্ত হিংসার দম্ভাপনা কেমন আমাদের বাঙালীজাতি একথা জানে না। যুদ্ধ নেই, মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করবার উপায় আমাদের নেই, রক্তের চেহারা না দেখে দেখে একথা ভুলেই গেছি যে, আমাদের শরীরে রক্ত আছে। আজ যখন গাড়ীর মধ্যে রাইফেলটা আমার পায়ের উপরে পড়ে রয়েছে, তখন যেন তার লৌহ দেহের ভয়ঙ্কর ছিদ্রটা চোখ রাঙিয়ে আমাকে বলতে লাগল, সাবধান, ছুঁয়ো না আমাকে, রাজদ্রোহের অভিযোগে সাত বছর কারাগার।

কাহুডাগের ডাকবাংলায় এসে যখন নামলাম, মনে হলো এক প্রেতপুরীর গভীর গর্ভ। কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না, কোথাও আলো নেই, লোকালয় নেই, জীবনের কোন চেতনা নেই। যেন কোন্ ভয়ঙ্করের চক্ষু চারিদিক থেকে আমাদের লক্ষ্য করছে। তিন চারিটা লণ্ঠন জ্বালানো হোলো। প্রাণ সংহারের নেশায় আমরা মশগুল, আমাদের ভিতরকার উত্তেজিত বর্বর আজকে আর ভয় স্বীকার করবে না। ভয়কে বারবার অস্বীকার করেছি এইজন্য যে, ভয় আমাদের ভিতরে বাসা বেঁধেছে। পরস্পর শুনলাম, অনেক সময়ে এই ডাকবাংলার ভিতরে জানোয়ার এসে লুকোয়,—প্যান্থর, লেপার্ড, আরো কত কি। এই ডাকবাংলার প্রাঙ্গণে হরিণ আসে, খরগোস আসে, সমভর্ আসে। অনেক সময় এখানকার রক্ষী নিজের প্রাণ

নিয়ে গ্রামের দিকে পালায়। নানারূপ কাহিনী শুনে আমরা সকলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে ঠিক যাত্রার সময়টির জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

আশ্চর্য, নিবিড়ভাবে এই প্রেতপুরীর অন্ধকারের প্রত্যেকটি বিন্দু আমরা অনুভব ক'রে দেখছি। এই দেয়াল, থাম, বারান্দা, এর কক্ষ, এর আনাচ-কানাচ,—এদের,—এদের প্রতি আর যেন বিশ্বাস নেই। হয়ত সাপ রয়েছে বিষধর ফণা উঁচিয়ে, বাঘ হয়ত থাবা পেতে রয়েছে নিকটের ওই ঝোপটার মধ্যে,—হয়ত প্রাচীরের গায়ে কৌশলে ওৎ পেতে রয়েছে কুটীল লেপার্ড, কিংবা হয়ত এমন কোনো ভয় ভীষণ জীব যার কল্পনাও আমার মনে নেই। অদ্ভুত স্বাদ আজকের এই রাত্রিটির ; যেন আজকের তারিখটা আমার পরমায়ুর পঞ্জিকায় লেখা নেই ; যেন কোন্ রহস্যময়ী নিঃতির ইসারায় আজ এখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছি।

গলার আওয়াজ আমাদের কমে এসেছে, নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে আর কারো ভরসা নেই ; একটা গভীর ত্রাস বুকের ভিতরে জমে উঠেছে, অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে দেখতে আর সাহসে কুলোচ্ছে না। কারো মুখেই কথা নেই, সকলেই কলের পুতুলের মতো নির্বাক! আমাদের সকলের উপরেই এই আদেশ হয়েছে যে, এখন থেকে সমস্ত সময়টা সম্পূর্ণ নির্বাক থাকতে হবে। এ রাজ্যে মানুষের সমাগম হয়েছে একথা ঘুণাক্ষরেও জানোয়ার-জগতে জানতে দেওয়া চলবে না। তাদের আক্রমণ করতে হবে অতর্কিত ; তারা যেন কোনরূপে বাঁচবার সুযোগ না পায়।

পিছনে থেকে কার স্পর্শ পেয়ে হঠাৎ আঁৎকে উঠলাম। ফিরে দেখি, সেই বিরাট কৃষ্ণকায় মানুষ। মুখে কথা সে বললে না ; কেবল লাঠিটা আমার হাতে গোছিয়ে দিয়ে একটু হাসলে। তার প্রশান্ত হাসি, তার বড় বড় চোখ, তার ভঙ্গী, তার দেহ,—আমার মনে হোলো সেও যেন একটা ভীষণ হিংস্র জানোয়ার। দিনের আলোয় তাকে দেখেছি, কিন্তু এই জঙ্গলের ধারে এসে তার চেহারা বদলে গেছে, এই অন্ধকার শঙ্কাসঙ্কুল অরণ্য ভূমিতেই তাকে মানায়। তার লোমবহুল দেহে যেন চারিদিকের ওই অরণ্যের একটা সামঞ্জস্য আছে।

চুপি চুপি তাকে বললাম, তোমার নাম কি ?

বিষধর সাপের মতো হিস হিস করে বলল, ইমান আলী।

ভীষণ, নিষ্ঠুর, কিন্তু সুন্দর। যেন রুদ্র দেবতার প্রসন্ন একটি রূপ। আমি মনে করেছিলাম সে হিন্দু। পরম প্রীতির সঙ্গে সে হিন্দী ভাষায় বললে, একলা ওখানে দাঁড়াবেন না, এই দিকে যান্‌।

জয় দুর্গা, শ্রীহরি! রাত নটা। এইবার আমাদের যাত্রা শুরু। রাত্রির অবহেলা শেষ হয়েছে। তেওয়ারী গাড়ী ঘোরালে। গাড়ীর হুড খোলা; নগেনবাবু রাইফেল রেডি রাখলেন, দাদু বন্দুক হাতে উন্মুখ। বৌদিদি বসলেন তাঁর স্বামী আর তেওয়ারীর মাঝখানে। ইমাম আলী হুডের উপরে বসে আমার কাঁধের উপর দিয়ে পা ঝুলিয়ে দিল। ভদ্র মুসলমানকে কাঁধে নিতে আপত্তি নেই। সমস্ত সঠিক বন্দোবস্ত হবার পর আমাদের গাড়ী ছুটল জঙ্গলের দিকে। গাড়ীর হেডলাইট দুটো অতি উজ্জ্বল; লেপার্ডের দুটো চোখের মতো। যেন নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে শিকারের টুঁটি কামড়ে ধরবে ব'লে।

সবাই জানি, যাত্রাটা বিপজ্জনক কিন্তু তার জন্য আমরা প্রস্তুত। জন্তু-জানোয়ারকে খুঁচিয়ে বেড়ানো একটা প্রচণ্ড নেশা ও উল্লাস। আমাদের গাড়ী পুনরায় গ্রাণ্ডট্যাঙ্ক রোডের অন্ধকার বিদারণ ক'রে লঘু গতিতে চলেছে। এই পথের দুধারে জানোয়ারের সমাগম সবাই জানে। ট্যুরিষ্টরা প্রায়ই এখানে বিপদে পড়ে! অনেক সময় দেখা যায়, পথের ধারে লেপার্ড ব'সে থাকে গরুর গাড়ীর মানুষ ধরবার জন্য! অনেক সময় মোটরের পরেও তারা আক্রমণ করে। তাদের বলে, 'আদমখোর' (**Man-eater**)। কোনো শিকারী যদি 'আদোম-খোর' বাঘকে না মারে, যদি সুবিধা পেয়েও ছেড়ে দেয়, তবে সে ঘোরতর অপরাধী। কারণ একবার মানুষ খেলে আর সে বাঘ অন্য কোনো জানোয়ার খেতে চায় না, মানুষের বসতির ধারে ধারে তার যত উৎপাত। মানুষ বড় সুস্বাদু, মানুষের রক্তে নুন আছে। মানুষকে খাবার দ্বিতীয় সুবিধা এই যে, মানুষ আক্রান্ত হ'লে চীৎকার করে, ছটফট করে, কিন্তু প্রতিবাদ করে না; আক্রমণের বদলে আঘাত

করে না। সেই জন্য ব্যাঘ্রের বিচারে ছাগল আর মানুষ প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত।

আমরা প্রত্যেকে নির্বাক। নিশ্বাস ফেলছি ধীরে ধীরে। গাড়ীর কোনো শব্দ নেই, হর্ণ-এর আওয়াজ নেই, অর্থাৎ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ ক'রে এই কথাটা প্রকাশ করতে হবে, এই গাড়ীখানাও একটা অতিকায় জন্তু, কারণ দূর থেকে হেড-লাইটের দুটো বিশাল চোখ ছাড়া গাড়ীর অন্য অংশ আর কিছু দেখা যায় না।

দুই দিকে ফাঁকা জায়গা আর নেই, মাথার উপরে আকাশ হ'য়ে এসেছে সঙ্কীর্ণ; বৃক্ষশ্রেণী যেন পথের দুপাশে শত শত দানবের মতো প্রহরায় নিযুক্ত। শীতের বাতাসে দেহের সকল ইন্দ্রিয়, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড়, অনড়, অবশ। মাঝে মাঝে আমার বিহ্বল বিমূঢ় প্রাণ যেন দুই চোখের তারায় উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। নিষ্ঠুর আনন্দ আর উত্তেজনায় বন্ধ ওষ্ঠাধরের ভিতরে দাঁতগুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটা আর্তস্বর ছুটোছুটি করছে! যেন খাঁচার ভিতরে দুরন্ত একটা পাখী মুক্তির জন্য মাথা কুটছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, মুখে শব্দ করবোনা, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে সকলের দিকে একবার তাকালাম। ইমাম আলী স্পট্‌লাইট ফেলতে ফেলতে চলেছে, সেই আলোর আভাস দেখলাম আমাদের চারিটি মানুষের মুখ। বাস্তবিক, সেই রাত্রে অকস্মাৎ যেন সন্দেহ হোলো আমরা কি মানুষ? দাদুর চেহারাটা যেন কেশরফোলা সিংহ; নগেনবাবুর উৎসুক চক্ষু অজগর সাপের মতো ঝিকমিক করছে; অতিকায় ভাল্লুকের মতো প্রচণ্ড রক্ত-পিপাসা নিয়ে ইমাম আলী যেন দুই থাবা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে। শেষ মানুষ আমি। কেমন চেহারা আমার? কী আছে আমার চোখে? আমি ভাবছি আমরা সবাই এক। হিংসায়, লালসায়, লোভে-স্বার্থপরতায়, আত্মরক্ষায় জানোয়ারগণের সঙ্গে কোথায় আমাদের প্রভেদ? যদি থাকে কোনো প্রভেদ তবে সে অতি সূক্ষ্ম। মানুষ, বনমানুষ, ভাল্লুক, বানর,—এরা হাত দুটো ব্যবহার করে, কাজে লাগায়, তাই এরা বুদ্ধিজীবী। এপ-রা হাসে, ভাল্লুক কাঁদে, বনমানুষ মানুষের মতো গলার আওয়াজ করে,—আর মানুষ 'কথা' বলে; মানুষের কিছু জ্ঞান আর কিছু ধ্যান বেশি। বাঘ শিকার করে একটা ছাগল,

একটা গরু, একটা মহিষ! মানুষ শিকার করে একটা দুর্বল জাতিকে, একটা দেশকে। ক্ষুধার খাদ্য পেয়ে জানোয়ার খুশী; মানুষের লালসা আরো বেশি—তারা চায় প্রভুত্ব করতে, শোষণ করতে, দরিদ্র দেশের উপরে অকারণ দস্যুপনা করতে।

শীতের তীব্রতায় অবশ হয়ে ব'সে আছি। সমস্ত অঙ্গ আর ইন্দ্রিয় চেতনাহীন, কিন্তু মন নিজের কাজ ক'রে চলেছে। এক সময় রাস্তার উপর থেকে গাড়ী নীচে নেমে প্রথম জঙ্গলের পথে প্রবেশ করলো। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে কোনো গাছের চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় না, মাঝে মাঝে কাঁটালতায় গাড়ীর মাডগার্ড আঘাত করছে। সম্ভবত কোনো সময় কোনো শিকারীর দল এই পথ দিয়ে গিয়েছিল, হেড লাইটের আলোয় তারই চিহ্ন ধ'রে তেওয়ারী গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেল। এঁকে-বেঁকে ঘুরে-ফিরে ওলট-পালট খেয়ে মোটর চলেছে। জনমানবের চেতনা কোথাও নেই মাঝে মাঝে গাছের ভিতর দিয়ে শীতের বাতাস মর্-মর্ শব্দে বয়ে চলেছে। আমরা নির্বাক, স্তম্ভিত। হত্যার সঙ্গে শিকারে পার্থক্য কি কিছু নেই? প্রথমটা কেবলমাত্র রক্তপাত, দ্বিতীয়টার ভিতরে রয়েছে একটা দুর্জয় দুরন্তপনা, গভীর আবিষ্কারের আনন্দ, অরণ্যের রোমান্স, আপন বিক্রমকে উপলব্ধি করার একটা অদম্য প্রচেষ্টা। আমাদের গাড়ী চলেছে যেন এক স্বপ্নময় রূপকথার রাজ্যে। মাঝে মঝে ইমাম আলী আলীর স্পট্‌লাইটের আভায় দেখতে পাচ্ছি শত শত মণিমাণিক্যের জাজ্জ্বল্যমান দীপ্তি। পরে জানা গেল সেগুলি জীব জানোয়ারের কোতূহলী চক্ষু। আলো দেখলেই তাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগে, তারা দিশা হারিয়ে ফেলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এই উজ্জ্বল চক্ষু ছাড়া প্রথমটা তাদের দেহের আর কোনো অংশ দেখা যায় না,—একথা শিকারীমাত্রই জানে। বাঘের চক্ষুতে আলো পড়লে তার চোখ রক্তবর্ণ দেখায়—ইমান আলী একথা জানে। বাঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলী ছোড়াটা নিতান্ত বিপজ্জনক।

মোটর চলেছে অতি সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গাকৃতি পথে। মাথার উপর দিয়ে ঘন জঙ্গলে আমরা আবৃত। আকাশ নেই, আলো নেই, আমাদের নিশ্বাসটির পর্যন্ত শব্দ নেই। গাছের ডালগুলি প্রায়ই আমাদের গায়ে আঘাত করছে।

অটল নীরবতায় অরণ্যের যেন কণ্ঠরোধ হ'য়ে রয়েছে। গভীর নিবিড় নৈঃশব্দ্য, লতা পাতা ফুল ফল যেন সবাই স্তম্ভিত, তারাও যেন হঠাৎ কৌতূহল কানাকানি থামিয়ে সবিস্ময়ে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে; আমরা দূর পৃথিবী থেকে এসেছি তাদের রাজ্যে—তারা কখনো মানুষ দেখেনি।

আমাদের গাড়ী থামলো। হেডলাইট নিবিয়ে দেওয়া হোলো; ইমাম আলী স্পট্‌লাইটটাও বন্ধ ক'রে দিলে। অর্থাৎ আমরাও ডুব দিলাম এই অরণ্যের সমুদ্রে, আমরা সবসুদ্ধ নিশ্চিহ্ন; চোখ মেলে রইলাম। কোথাও জানোয়ারের গন্ধ নেই; কোথাও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় না। চোখ খুলে থাকা আর চোখ বন্ধ করে রাখা একই কথা; দুই অবস্থাতেই যেন কঠিন নিরেট অন্ধকারের দেওয়াল আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরেছে। অরণ্যের কোন্ রহস্যময় গভীর গর্ভে বনদেবী যেন বসেছেন তপস্যায়—সেই তপস্যার আসনের চারিদিকে পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, সুরাসুর নিমীলিতচক্ষে স্তব্ধাসীন। এখানে আমরাই এসেছি দানবীয় ক্ষুধা নিয়ে, রক্তের পিপাসা নিয়ে—প্রাচ্যভূমির প্রশান্ত তপোবনে শ্বেতাঙ্গ জাতি যেমন এসেছিল বর্বর লালসা নিয়ে। মন বলছে, শিকারের লোভ ক'রো না, চারিদিকে একবার চেয়ে ছাখো। বনদেবীর তপস্যায় খুশী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন মহাযোগী। বৃক্ষজটায় জটিল তাঁর মহাশঙ্খ, প্রশান্ত ধ্যানলীন নেত্র, পরনে ব্যাঘ্রচর্ম,—হে প্রাচীন, তোমাকে নমস্কার করি।

খস্‌খস্ শব্দ হোলো,—ডালপালার সরসরানি। মুহূর্তে জ্বলে উঠল হেডলাইট। ইমাম আলী স্পট্‌লাইট দিলে। ধনুর্বাণের মতো দ্রুত ছুটে গেল কয়েকটা কুকুর। বন্য কুকুরের দল হরিণের সন্ধান পেয়ে পশ্চাদ্‌ধাবন করেছে; হরিণের আর রক্ষা নেই। চারিদিকে থেকে ওরা হরিণকে ঘিরে মারবে, এই ওদের কাজ। এই কাজ প্রকৃতির। সৃষ্টি ও ধ্বংসের কাজ চলছে সমতালে। হরিণের জন্মের হার সব জন্তুর চেয়ে বেশি, তাই তারা মারা পড়ে সব জন্তুর কবলে। সেই আদিম নিয়মে চলছে জন্ম আর মৃত্যু। কে মারে, কে মরে। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম নিজেদের দিকে। এ কী পরিবর্তন হোলো আমাদের? অরণ্যের ছায়া কি পড়েছে সকলের মুখের

উপর ? শিকারীদের আর মানুষ বলে চেনা যায় না,—যেন তাদের মানুষের মুখোসগুলো খুলে পড়েছে। আলোর আভায় যেন মনে হচ্ছে তাদের মুখে, চোখে, দাঁতে, ভঙ্গিতে হিংস্র শ্বাপদের ভয়ভীষণ ছায়া,—সেই নিষ্ঠুর লোভ সেই উজ্জ্বল লোলুপ চক্ষু, দন্ত ও জিহ্বার সেই একাগ্র লালসা !

তেওয়ারী আবার গাড়ী ছেড়ে দিলে। আবার কিছুদূর আমরা অগ্রসর হয়ে গেলাম। হিংস্র জন্তুর জন্য প্রতি মুহূর্তে আমরা সজাগ, দৃষ্টি আমাদের একাগ্র, অস্ত্রগুলি উন্মুখ। স্পটলাইটের আলোয় অরণ্যের চেহারা দেখে প্রাণ শঙ্কিত হয়ে উঠছে। আবরণের পর আবরণ খুলে মায়াবিনী কোথায় নিয়ে যায় ?

গুড়ুম !!

অরণ্যে, পর্বতে, শূন্যে আমাদের রক্তের প্রবাহতলে এই শব্দটা কেমন যেন অদ্ভুত আর্তনাদ করে উঠলো। দাদু গুলী ছুড়ে খরগোস মেরেছেন ! কিন্তু সে কেবল একটি মুহূর্ত ; তারপর আবার বনানী নিথর, নিস্পন্দ। বনদেবীর একটি নিরুপায় সন্তান বিদেশীর দস্যুর অত্যাচারে প্রাণ বিসর্জন দিল, তিনি আর্তনাদ ক'রে থেমে গেলেন,—গুলীর শব্দে এই কথাটাই শোনা গেল। কিন্তু কী উল্লাস আমাদের ! প্রাণ নেবার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরাক্রমের স্বাদ আছে। লক্ষ্যভেদ করার ভিতরে আছে চিত্তোন্মাদনা, দুরন্তপনার সম্মোহনী শক্তি !

খরগোসটা এনে গাড়ীর মধ্যে রাখা হলে। জন্তুটা ছোট নয়, গায়ের লোমগুলো কটা, কান দুটো দীর্ঘ, গলার কাছে রক্তের ধারা নেমেছে লোমের ভিতর দিয়ে। চোখ দুটো তখনো তার জাগা, তখনো সেই চোখে এসে পৌঁছয়নি মৃত্যুর পাণ্ডুরতা, তখনো সে স্তম্ভিত বিমূঢ়। ম'রে গেছে, কিন্তু দেহের উত্তাপটা এখনো মরেনি, এখনো কোমল দেহটি শিথিল ভঙ্গিতে শয়ান—এখনো শক্ত হ'য়ে যায়নি। তার মরা দেহটার উপরে আমার পা ঠেকলো। হ্যাঁ, মাংসটা নরম। সুস্বাদু মাংস, তা'তে আর সন্দেহ নেই। আগামী কালের আহারের তালিকাটা লোভনীয় হবে বটে !

কিন্তু মৃতদেহটাকে ছুঁয়ে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হ'তে লাগলো। তার লোমবহুল দেহের ভিতরে মৃত অরণ্য যেন

অসাড় হ'য়ে রয়েছে। কী করলাম আমরা? কা'কে মারলাম? অরণ্য-দেবতার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝ'রে পড়ছে রক্তের ধারা। সেই অতল নীরবতাকে ভেদ ক'রে যেন দেবী প্রকৃতির অশ্রুকাতর প্রতিবাদ কানে এসে পৌঁচচ্ছে,—বৎসহারা জননী কেমন ক'রে কাঁদে? তবে কি নিরুপায় প্রাণীর উপরে অস্ত্রপ্রয়োগ করা সভ্য মানুষের চরম পরিচয়? তবে কি দুর্বলকে সংহার করাই বৈজ্ঞানিক সভ্যতার রীতি?

গাড়ী চলেছে ধীরে ধীরে। যারা হত্যা করতে আসে তারা জানোয়ারই খোঁজে, অরণ্যকে দেখতে পায় না। অরণ্যের আছে একটি বিশিষ্ট রূপ, তার আত্মার চেহারাটি প্রশান্ত। বৃক্ষলতার সঙ্গে পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ নিবিড় বন্ধুত্বের সুত্রে গাঁথা, তারা পরস্পরকে জানে। একটু আওয়াজ, একটু অশান্তি—অমনি তারা সর্তক হয়ে যায়; তাদের স্বভাবের রূপটা চাপা পড়ে। সাপ, গিরগিটি, বানর, শৃগাল, পাখী—তারা যেন একই ভাষায় কথা বলে, মানুষের ইসারায় তাদের আলাপ যায় থেমে। মানুষ তাদের কাছে একটা অস্বাভাবিক অপরিচিত জানোয়ার, তার চেহারা ও চালচলনের সঙ্গে অরণ্যবাসী প্রাণিগণের কোন পরিচয় নেই,—সেজন্য ব্যাঘ্র পর্যন্ত মানুষের চেহারা দেখলে পালায়, অকারণে আক্রমণ করে না। বিরক্ত ও আক্রান্ত ব্যাঘ্রই মানুষকে হত্যা করে; অবশ্য 'আদম-খোর' ছাড়া—কারণ মানুষের রক্তের সুস্বাদ তাদের জানা আছে। মানুষ দেখলে আর তারা সংযম পালন করে না।

যেন বিরাট একটা সভামণ্ডপ! তার নীচে বনস্থলীর সহজ, নিশ্চিন্ত, নিভৃত জীবনধারা। অজস্র অজানা পাখীর দল গাছের আগায়, ডগায় ডগায় কাঠবিড়ালী, সাপ, গিরগিটি; কোটরে কোটরে বিচিত্র কীটপতঙ্গ; নীচে শৃগাল, খরগোস, হরিণ, শম্ভর, বাঘ, ভাল্লুক। দুর্গম বৃহগহ্বরে বানর হনুমান শকুন—নানা জীব। কোথাও শীর্ণ কোনো জলাশয়ের প্রান্তবর্তী জঙ্গলে ব্যাঘ্রী আপন শাবকগুলিকে রেখে বিশ্রাম করছে—সজাগ একাগ্র তার দৃষ্টি। কোথাও লেপার্ড লক্ষ্য করছে পথভ্রান্ত হরিণের প্রতি। অরণ্যের হরিণ বড় অসহায়। কোথাও নির্বোধ কুকুরের দলকে চতুর শৃগাল হায়রাণ ক'রে ফিরছে। আবার পূর্ণিমার রাত্রে দেখা যাবে কোনো বাউল

বোহেমিয়ান্ ভাল্লুক মহুয়ার বন থেকে মহুয়া চুরি করে খেয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে চলেছে। ভাল্লুক বড় উদাসীন। কিন্তু তার ক্রোধান্ধ চেহারাটা বড় ভয়ঙ্কর। শত্রু দেখলে দুই হাত তুলে উন্মত্ত হিংসায় মানুষের মতো তেড়ে আসে—দুই হাতের নখ দিয়ে শত্রুকে ছিঁড়ে ফেলে। বাঘ চলে নতমস্তকে, অতি নিরীহ অমায়িক। চোখের ভিতরে বৈরাগ্য-নিমীলিত দৃষ্টি, চলনে রাজোচিত আভিজাত্য, পদক্ষেপগুলি ধীর, মুখের ভাবে আত্ম-গরিমার সুদূর অহঙ্কার। সহসা একটি অপ্রাকৃত শব্দ। ব্যাঘ্রবর মুখ তুলে তাকালেন। সে দৃষ্টি অতি চতুর। প্রত্যেকটি বৃক্ষলতা, ফুলফল, পথঘাট—সমস্ত তার পরিচিত। নতুন কোনো চিহ্ন, নতুন কোন কিছু পরিবর্তন তার চোখ এড়াবে না। একটি আলপিন, একটি কাগজের কুটি, দেশলাইর পোড়া কাঠি, খাদ্যের টুকরো, সিগারেটের শেষাংশ, কার্তুজের খোল—অর্থাৎ এমন কিছু যার সঙ্গে অরণ্যের চরিত্রের ঐক্য নেই—বাঘের চক্ষু সেই তুচ্ছতম বস্তুটিকেও এড়িয়ে যায় না, নজরে তার পড়বেই। কোনোরূপ উত্তেজনা সে প্রকাশ করবে না, কেবল ল্যাজটা বার দুই মাটিতে আছড়ে ধূলো উড়িয়ে সে চলে যাবে। বাঘেরা আজন্ম সংশয়ী।

টর্চের আলোয় অরণ্যের কতটুকু দেখা যায়? আমার পরম বিস্মিত প্রাণ চোখের তারায় ফুটে রয়েছে। জানোয়ারকে অতর্কিতে হত্যা করার ভিতরে কোথায় যেন পৌরুষের অভাব আছে ব'লে মনে হয়। এ যেন একটা চৌর্যবৃত্তি। নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় রেখে নিরপরাধ ও নিরস্ত্র প্রাণীকে পিছন থেকে বধ করা, যেন হাবসাদের ঘরে ঢুকে ফাসিজম-এর নির্লজ্জ দস্যুবৃত্তি। যদি আমাদের এই আয়োজনটা ব্যর্থ হয় তবে আমার কোনো দুঃখ নেই। অরণ্য-জীবনের চেহারাটা আমার কাছে বড়, জানোয়ারের মৃতদেহ তুচ্ছ। এত দেশ, এত রাজ্য অতিক্রম করেছি কিন্তু এমন বৈচিত্র্য কোথাও খুঁজে পাইনি। লোকালয় ছেড়ে গিয়েছি নতুন লোকালয়ে, গঙ্গার উপত্যকা ছেড়ে গিয়েছি সিন্ধুর উপত্যকায়, নেপাল থেকে গিয়েছি গাড়োয়াল, কন্যা, কুমারিকা থেকে কর্ণপ্রয়াগ,—কিন্তু অরণ্য আমার চোখে পরম বিস্ময়! নিবিড় বনশ্রেণী আর অগণ্য হিংস্র জানোয়ার—সে অরণ্যটা কেবল উপন্যাসের বর্ণনা; সে বর্ণনায় শিশুপাঠককে ভোলানো সহজ। কিন্তু এই নিস্তব্ধ

গভীর রাত্রে, এই বিজন ভীষণ বনানীর গহ্বরে, বৃক্ষলতার পত্রে-পত্রে যেন সুদূর প্রাচীনের রহস্যময় লিপি পাঠ করতে চলেছি। আলী-পুরের সৌখীন চিড়িয়াখানায় যে পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণীগুলি বহু-বিচিত্র কণ্ঠে চীৎকার করে, এখানে তাদের স্বচ্ছন্দ দুর্বার জীবন, এখানে তারা বিচিত্র ভাষায় কথা বলে, আলাপ করে, গান গায়। বৃক্ষশ্রেণীর জটায়, লতায় লতায় সেই একই ভাষা, একই লিপি, একই কথা। মনে হোলো কান পেতে শুনে যাই ওরা কী বলে ; প্রাণ পেতে জেনে যাই ওরা কী চায়! ঝোপে-ঝাড়ে, পাতার ফাঁকে, পথের বাঁকে, শাখা-প্রশাখার অন্তরালে অসংখ্য অগণ্য দীপ্ত চক্ষু। এরাও আমাদের দেখে বিস্মিত, হতচকিত। লোকালয়ে বাঘ এসে দাঁড়ালে কেমন চাঞ্চল্য দেখা দেয়? অরণ্যভূমিতে মানুষ গিয়ে দাঁড়ালে জানোয়ারদের ভিতরেও সেই একই চাঞ্চল্য।

তপোবনের প্রসন্ন রূপটি কেমন? যেন আমরা সন্ধান ক'রে ফিরছি পরম আকর্ষণকে। এখনই তাদের দেখা পাবো,—সেই জটাজুটধারী প্রাচীন ঋষিগণ কোথায় থাকে? যারা সৃষ্টি করেছে বেদ বেদান্ত, উপনিষৎ? যারা মানুষের চিরদিনের স্বপ্নদর্শনের রহস্য জানে তারা কি বিচরণ করে এখানে? কোথায় কন্বমুনির আশ্রম, কোথায় তপস্বিনী শকুন্তলা? হয়ত এই পথ দিয়ে গিয়েছিল রাজপুত্র, এই অরণ্যের ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল চিত্রলেখা। একাগ্র আশায় বিহ্বল আমার চক্ষু আবিষ্কারের নেশায় অপলক চেয়ে রইল।

এমন সময় অকস্মাৎ দূরে যেন মানুষের অস্ফুট কোলাহল শোনা গেল। তার সঙ্গে কানে এলো ঘণ্টার টুংটাং শব্দ। ইমাম আলী চুপি চুপি বললে, গাঁও, সাবধান, রাইফেল ছুড়বেন না।

গ্রাম! আমি হতচকিত হয়ে গেলাম। এখানে মানুষ থাকে? কী জন্য থাকে তারা? তাদের কি জানোয়ারের ভয় নেই?

দাদু তাঁর হাতঘড়ির দিকে লক্ষ্য ক'রে আঙুল দেখিয়ে জানালেন, রাত একটা।

গ্রামের কাছাকাছি আসতেই লোকজন ছুটে এলো। কতকগুলি কৃষ্ণকায় জংলী, দুর্বোধ্য তাদের ভাষা। তারা যেন মানুষ ও জানোয়ারের মাঝামাঝি একটা কোনো জাত। কাছে এসে সবাই ভিড় করে দাঁড়ালো। নানা

আলোচনার পর এই স্থির হোলো যে, আমরা এখান থেকে জনকপুর জঙ্গলের দিকে যাবো। সেখানে সম্প্রতি 'আদম-খোর' বাঘের বড় উৎপাত শুরু হয়েছে। কিন্তু তার আগে হরিণের সন্ধান করা যাক্, এদিকে তাদের খুব প্রাচুর্য।

শঙ্কাকুল হৃদয়ে আমরা গাড়ী থেকে নামলাম। বৌদিদিকে নিয়ে তোওয়ারী গাড়ীর ভিতরে রইল। কতকগুলি জংলী লোককে সঙ্গে করে আমরা সকলে সেই অন্ধকারে কাঁটাব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হলাম। আমার হাতে একগাছা লাঠি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই।

সন্দেহ আর আশঙ্কায় প্রতি পদক্ষেপটি গুনে গুনে আমরা চলেছি। কারো মুখে কোনো শব্দ নেই।

এই জঙ্গলটার খ্যাতি বিহারে কম নয়। এর নাম কাহুডাগ কেন হোলো তা আমরা জানিনে। গয়া জেলার মধ্যে যে জঙ্গল-গুলি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন,—যথা, রজৌলি, একতারা জনকপুর,—কাহুডাগ এদেরই একটি। বিশাল পর্বত, গহন অরণ্য, দুর্গম গুহা লোকালয়হীন পার্বত্য উপত্যকা, বালুবহুল উপলখণ্ডময় জলধারা, এদেরই ভিতরে ভিতরে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, প্যানথর, লেপার্ড্, হরিণ, শম্ভর প্রচুর। এই অরণ্যের ব্যাস ও দৈর্ঘ্য নির্ভুল হিসাব কঠিন—শোনা যায় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে শত শত মাইল। যাঁরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি অরণ্য প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযোগসূত্রে গ্রথিত। অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যের সঙ্গে শ্রীহট্টের যোগাযোগ, সুন্দরবনের সঙ্গে নৈমি-যারণ্যের। আমারও মনে হয় কথাটার সঙ্গে সত্যের ছোঁয়াচ আছে। ভারতবর্ষ অরণ্যময় দেশ এতে আর সন্দেহ নেই, মাঝে মাঝে প্রান্তর আর জনপদ, মাঝে মাঝে নদী ও পর্বতের ব্যবধান। এর জন্য অরণ্যগুলির ভিতরেই কেবল আত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটেনি, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাগও হয়েছে,—অর্থাৎ কেউ দক্ষিণী, কেউ গুজরাটি, কেউ বর্মী, কেউ বা বাঙ্গালী। বিহারে দেখেছি অরণ্যে অরণ্যে আত্মীয়তা। পালামৌ, হাজারিবাগ, কোডার্মা, গোমো, নিমিয়াঘাট, পরেশনাথ, রাজগৃহ, গয়া—রাষ্ট্রিক ব্যবধান ছাড়া এদের

মধ্যে আর কোনো কথা নেই। দেওয়ানি মামলায় হাকিমের নির্দেশ মেনে নিয়ে ভাই-ভাই যেন ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে গেছে, বাইরের লোকের স্বার্থের সংঘাতে ঘরের মধ্যে লেগেছে আত্মীয়-কলহ। বিহারের অরণ্যগুলির ভিতরে আবহের ঐক্য সহজেই বোঝা যায়,—জল বাতাস, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি—অনেকের বিশ্বাস বর্মা ও সুন্দরবনের তুলনায় বিহার অনেকাংশে নিরাপদ—স্বাস্থ্যের দিক থেকে।

বিস্তৃত নদীবহুল অরণ্যে শিকারীদের অসুবিধা আছে। জানোয়ার সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে, পলি-পড়া মৃত্তিকায় সাপের উৎপাত হয় প্রচুর; বিপদের সম্ভাবনা বেশি। সেইজন্য সুন্দরবনে আত্মরক্ষার সমস্যাটাই বড়। শুষ্ক মৃত্তিকায় দুর্যোগ কম। বালুময় নদী, জল আছে কিন্তু কাদা কম। বিহারের জঙ্গলগুলি সেইজন্য যশোহর, খুলনা ও বরিশালের দক্ষিণভাগ অপেক্ষা কিছু 'ভদ্র'।

আমাদের প্রথম বিস্ময় জাগলো মানুষের গন্ধ পেয়ে। এই গহন অরণ্যে মানুষ! কিন্তু বিস্ময় কেন? এস্কিমোরা মানুষ, পশ্চিম আফ্রিকার নরখাদকরা মানুষ, নরমুণ্ডলোভী ফাসিষ্টরাও মানুষ,—তবে এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে মানুষ থাকবে না কেন? কিছুদূর অন্ধকারে অগ্রসর হয়ে দেখা গেল কয়েকঘর দেহাতির বাস। তারা দিনের বেলা চাষ করে, গৃহপালিত পশু বিক্রি করে, কিন্তু সূর্যাস্তের পর আর তাদের সাড়াশব্দ থাকে না! অনেকেই মাঝে মাঝে জানোয়ারের মুখে প্রাণ দেয়, অনেকে আবার বর্শা, বল্লম, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা জানোয়ারকেও বধ করে। রাত্রে যদিই বা তারা ঘরের বা'র হয়, দল বেঁধে যায় হল্লা করতে করতে। শিকারী কোথাও এসেছে সন্ধান পেলে তারা সাগ্রহে সাহায্য করতে ছুটে আসে বক্‌শিশের লোভে। একজনের ঘরের দরজায় এক প্রকাণ্ড শম্‌ভর বাঁধা রয়েছে দেখা গেল। শম্‌ভর হরিণেরই মাসতুতো ভাই—নিরাহ জীব, মারতে জানে না, মরতে পারে সহজে। ভারতবাসীর সঙ্গে ওদের প্রকৃতিগত ঐক্য। আমাদের দেখে কয়েকজন এসে দাঁড়াল। তারা আমাদের সঙ্গী হবে। আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিনে, যেন পরস্পর সকলেই বিচ্ছিন্ন, কেউ কারোকে চিনিনে। উপরে, নীচে, বামে, দক্ষিণে অন্ধকারের পর

অন্ধকারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর, সেই প্রাচীর ভিতরে ও বাহিরে একাকার, নিরাকার। আমরা সবাই সমশ্রেণীভুক্ত,—কৃষ্ণকায় প্রেতের দল। দাদু মিলিয়ে গেলেন জংলীদের মধ্যে, নগেনবাবু ইমাম আলীর পার্থক্য গেল ঘুচে, আমার সঙ্গে বৃক্ষ-জটার প্রভেদ রইলো না। যে-আত্মীয়তা ছিল লোকালয়ে দিবালোকে, এই দুর্গমে তার যেন আর চিহ্ন নেই। অস্পষ্ট ইঙ্গিতাত্মক ভাষা, চাপাকণ্ঠের দুর্বোধ্য ষড়যন্ত্র, শঙ্কা ও সন্দেহে অবসন্ন প্রতি পদক্ষেপ,—কিন্তু উৎসাহে উল্লসিত প্রাণ, দুঃসাহসে দুর্জয় মন। আপন প্রাণ-চৈতন্যকে তখন স্পর্শ করতে পারি, নিবিড় ক'রে অনুভব করতে পারি আপন অস্তিত্বকে,—প্রতি রোমে রোমে পরম পুলক রোমাঞ্চ হয়ে উঠছে।

কেন? কেন প্রাণ এমন ক'রে নৃত্য করছে বুকের রক্ততরঙ্গের শিখরে শিখরে? বোধ হয় জীবনে প্রথম এসে নেমেছি প্রকৃতির অবারিত লীলাভূমিতে। দ্বার খুলে দাও দেবী, উন্মোচন ক'রে দাও তোরণের পর তোরণ, প্রবেশ করতে দাও তোমার জটিল রহস্যলোকে। তোমার প্রাণ মন্দিরের নিভৃত মণিকোঠার সন্ধান নিয়ে যাবো!

আমরা চলেছি নিঃশব্দে। তস্করের মতো চৌর্যবৃত্তির দিকেই আমাদের চোখ, দস্যুর মতো প্রাণলুণ্ঠনের কৌশল আবিষ্কার করার দিকে আমাদের লোভ। আমরা অরণ্যে আসি প্রাণসংহারের জন্যে, লোভ থাকে প্রচণ্ড, চক্ষু থাকে অন্ধ। মানুষ এক সর্বনাশা জানোয়ার। মানুষ মানুষকে মারে, জানোয়ারকে মারে, পাখীকে মারে, কীট-পতঙ্গকে মারে, উদ্ভিদ্‌কে মারে। মানুষের মধ্যে 'সভ্য' তারা, যারা সংহার করতে জানে সুকৌশলে। জানোয়ারও মানুষকে ঘৃণা করে, ভয় করে। ব্যাঘ্রও মানুষের ভয়ে ভীত, মানুষের গন্ধ পেলে তারাও পালায়।

অরণ্যের আকাশ সঙ্কীর্ণ, তবু মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে উজ্জ্বল নক্ষত্রদল। শাখায় প্রশাখায় লতায়-পাতায় শীতের তীব্র শীর্ণ বায়ু মর্মর শব্দে ব'য়ে চলেছে। চারিদিক অদ্ভুত ভাবে নিস্তব্ধ। সেই স্তব্ধতা গভীরতর হয় যখন শোনা যায় পাখীর শাবকের মৃদু আর্তনাদ, কীট ও পতঙ্গের করকরানি, কোনো

জানোয়ারের বিচিত্র অস্পষ্ট কণ্ঠ। আকাশের তারার আলোয় হাতড়ে হাতড়ে চলেছি, কোনদিকে কিছুই দেখছিনে—কিন্তু জানি আমাদের পথে অরণ্য-ঐশ্বর্যের সমারোহ। মাঝে মাঝে চলমান দুই পা থেমে যায় ফুলের গন্ধে, ঘুম-জড়ানো চোখে লাগে নেশা! কখনো কখনো ফলের মিষ্ট গন্ধে মাধুর্যে মন ভরে যায়। টর্চ্চের আলোয় দেখলাম এই ফুল আর ফলের পাড়ায় অত গভীর রাত্রেও এসেছে মধুলোভী মক্ষিকার দল। ওরা রাত্রে গা ঢাকা দিয়ে এসে মধু আহরণ করে যায়।

শুক্লপক্ষের রাত্রে শিকারীদের গতিবিধির অসুবিধা। অরণ্যের মর্মে মর্মে যখন জ্যোংস্না প্রবেশ করে, শিকারীকে তখন নিষ্ক্রিয়ভাবে মাচার উপর ব'সে থাকতে হবে। জানোয়ারের কান ভয়ানক উৎকর্ণ, চক্ষু তাদের সন্দেহে সজাগ। মানুষ নামক নূতন কোনো জানোয়ারের আবির্ভাব যদি অনুভব করে তবে হামাগুড়ি দিয়ে তারা গা ঢাকা দেয়। জ্যোৎস্নালোকে তাই মানুষকে তারা অতি সহজেই আবিষ্কার ক'রে ফেলে। কলিকাতা শহরের রাজপথে একটিমাত্র বাঘ দেখা গেলে যেমন সমগ্র শহরে চাঞ্চল্য জাগে, তেমনি অরণ্যে কোথাও মানুষের আবির্ভাব ঘটলে জানোয়ারগণের মধ্যে চলে আন্দোলন। কেউ ঘোষণা ক'রে দেয় গর্জ্জনে, কেউ শব্দে, কেউ ছুটাছুটিতে। ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অনুভবশক্তি মানুষের অপেক্ষা তাদের অনেক বেশি। আত্মরক্ষার আয়োজন তাদের অসামান্য। ব্যাঘ্রের চাতুর্য ও কুশাগ্রবুদ্ধি সর্বজনবিদিত। তবু তারা যখন প্রাণ দেয় তখন বুঝতে হবে মানুষ তার অসতর্ক মুহূর্তের সুবিধা নিয়েছে। রাজা-রাজড়া, লাট-বেলাট যখন বাঘ মারে তখন তাদের প্রশংসা ও ছবি ছাপা হয় কাগজে কাগজে, কিন্তু শিকারীমাত্রই জানে এই হত্যাকাণ্ডে পৌরুষ নেই। ভারত-শাসন-পরিষদের অমুক সভ্য, অমুক প্রাদেশিক গভর্ণর, অমুক নেটিভ যুবরাজ, অমুক আই-সি-এস এদের শিকারের মধ্যে গোপন কথা থাকে। দু'এক ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু যখন শুনি সতেরো বছরের নেটিভ প্রিন্স ব্যাঘ্র শিকার করছে, যখন দেখি দৈনিক সংবাদপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় বীর কুমার রাইফেল্ হাতে দণ্ডায়মান, ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠের উপর তাঁর একটি চরণ—তখন হাসি পায়। প্রথমত এসব শিকারে শত শত লোক লাগিয়ে জঙ্গলকে চারদিক থেকে ঘেরাও

করে 'বীট' করা হয়; একদিকের পথ খোলা থাকে, সেই পথের ধারে উঁচু মাচার উপর ব'সে থাকেন নাড়ুগোপাল রাজকুমার; বাঘ যখন সেই পথ দিয়ে পালায় তখন ভালো একজন শিকারী তাকে প্রথম গুলী মারে; বাঘ যখন লোট-পালট খায় তখন কুমার তার শরীরের কোথাও গুলী বিদ্ধ করে। র্থাৎ জানোয়ারের শেষ প্রাণস্পন্দনটুকু কুমারই থামিয়ে দেয়। অমনি ারিদিকে ধন্য ধন্য। ছবি ছাপো, সম্পাদকীয় লেখো, উপহার পাঠাও, বীর ালকের জন্য উপযুক্ত রাজকন্যা বেছে আনো। অমন কত কী। বড় বড় রকারী কর্মচারীর শিকারের ইতিহাস আরো হাস্যকর। এরা কেউ শিকার রে না, হত্যা করে। বহু নামজাদা শিকারী আমার চেয়েও ভীতু, আমার য়ে দুর্বলদেহ। তারা সখের তৃপ্তির জন্যে যায় অরণ্যে, সাহসের পরিচয় িতে যায় না। একশত শিকারীর ভিতরে একজনকে হয়ত পাওয়া যায় যে তিভাবান,—জানোয়ারের গতিবিধি রীতিনীতি ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যার রিচয় আছে, যার আছে দুর্লভ দুঃসাহস, অজেয় প্রাণ, অসীম শক্তি, বলিষ্ঠ ায়ুমণ্ডলী। সমগ্র ভারতবর্ষের শিকারীদের ইতিহাসের এইরূপ একজন াত্র শক্তিমান শিকারীকে দেখা গেছে, আমরা বাঙালীরা তাঁর জন্য গর্বিত, নি স্বর্গীয় কে এন্ চৌধুরী। অনেকেই জানে চৌধুরী মহাশয় কখনো সতর্ক জানোয়ার বধ করেননি। বৃহৎ লেপার্ড, ভীষণ রয়াল বেঙ্গল—এদের তনি পাঞ্জা পাঠাতেন, আহ্বান করতেন সম্মুখ সমরে, সেই ভয়াল ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র খন চৌধুরী মহাশয়কে আক্রমণ করতো, তখন তিনি তাকে বধ করতেন। ই বধ করার কাজ বড় কঠিন, কারণ প্রায়ই এক গুলীতে বাঘ মরে না দর, পা, পাছা, এই সমস্ত স্থানগুলি বাদ দিতে হবে, কারণ এই সব স্থানে গুলী লাগলে বাঘ মরে না; মারতে হবে বুকে, শিরদাঁড়ায়, হাতের উপরিভাগে. কপালে কিম্বা রগে। আক্রমণশীল ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের সন্ধিস্থানে কম্পিত হাতে লক্ষ্য স্থির করা, নিজের লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস, সাহসের প্রতি ঢ়তা, নার্ভকে অবিচল রাখা, অপরাজেয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—এইগুণগুলির জন্য ক এন্ চৌধুরী অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অরণ্যই তাঁর উপর প্রতিশোধ নিল। তাঁর বিচারবুদ্ধিতে ঘটলো মুহূর্তের ভুল। আহত মুমূর্ষু ্যাঘ্রের চাতুরীর ফাঁদে তিনি ধরা দিলেন, কালাহাণ্ডির অজানা অরণ্যের

গভীর গর্ভে তাঁর সেই ভুল চিরস্থায়ী হয়ে রইলো। শিকারীদের জন্যে একটি পরম শিক্ষা রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে গেল।

ভারাক্রান্ত মনে চলেছি। দলের শেষে আছি কিন্তু আছি একা। শিকারের দিকে মন নেই, জানোয়ারের দিকে চোখ নেই। কথাবার্তা বলবার আইন না থাকার জন্য সকলেই সম্পূর্ণ নির্বাক। কৃষ্ণকায় বিশাল ইমাম আলীকে অনুসরণ ক'রে সকলেই চলছে নিরুদ্দেশে। কাঁটালতায় পথ আচ্ছন্ন, কোথাও বিপজ্জনক ডোবা, কোথাও লতাপাতার জটলায় পথ জটিল, আবার কোথাও অড়হরের ক্ষেত। মাঝে মাঝে চোখ পড়ছে জংলীদের প্রতি। অত শীতেও তাদের পরিচ্ছদ যৎসামান্য—অর্ধনগ্ন, অনাবৃত। তাদের মুখ চেনা যাচ্ছে না, তাদের চোখ দেখা যাচ্ছে না, একজনের সঙ্গে অন্যজনের পার্থক্য বুঝতে পাচ্ছিনে। দিনের আলোয় তাদের দেখলে হয়ত ভয় পেতুম। এই অরণ্যের বন্যতা, জানোয়ার-জগতের অদ্ভুত জীবনধারা, সভ্যতা-সম্পর্কহীন স্বভাব-সহজ প্রসন্ন প্রকৃতি—এদেরই ছায়া পড়েছে জংলীদের উপর। তারা বাঘের প্রকৃতি জানে, সাপের রহস্য জানে, পাখীর স্বভাব জানে, কিন্তু জানে না সভ্য মানুষকে। যেটুকু জানে সেটুকু কেবল হিংসায় উন্মত্ত শিকারীদের চেহারা। তারা ভাবে আমরাই দেশের রাজশক্তি, আমরাই শাসন করি পৃথিবীকে, আমরাই তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মোটর আর সাহেবী পোশাক দেখলে তারা প্রাণভয়ে পালায়, তারা মনে করে আর বুঝি তাদের রক্ষা নেই! অরণ্যবাসীরা অনেকেই এখনো জানে না যে ভারতবর্ষ নামক একটি দেশ আছে, সেই দেশ ইংরাজ নামক এক শ্বেতাঙ্গজাতির অধিকৃত, এবং দেশবাসী হিসাবে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনোই পার্থক্য নেই! কিন্তু বন্দুক আমাদের হাতে, সুতরাং আমরাই 'সরকার'। এমন অনেক 'সভ্য' নির্বোধকে আমি দেখেছি, যারা এইরূপ সরল দেহাতির কাছে নিজেকে 'সরকার' পরিচয় দিয়ে অন্যায় সুবিধা আহরণ করেছে। একটা প্রমাণ দেবো। শৈলশহর সিমলা থেকে কয়েক মাইলদূরে প্রতি বৎসর মে মাসে এক মেলা বসে। অনেক হোমরা চোমরা যান্ সেই পাহাড়ী মেলায়। উদ্দেশ্য ভালো, পরিচারিকার সন্ধান। আপন সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সেই মেলা থেকে পাহাড়ী মেয়ে ধ'রে এনে 'আয়া

নিযুক্ত করেন। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য অন্যরূপ; ভদ্র ও আইনানুগ উপায়ে নারীহরণ।

হে অরণ্য, কথা কও! এমন কথা বলো এই অমানিশার অন্ধকারে, এমন কথা লিখে চলো লতায় লতায়, জটায় জটায়, এমন ভাষা সঞ্চার করো তোমার কোটরে কোটরে, গহ্বরে গহ্বরে—যার রচয়িতা কেবলমাত্র তুমি; মানুষের মুখে শুনিনি যে কথা, যে-কথা ঋষিরা উচ্চারণ করেনি। পাতায় শাখায়, বৃক্ষের আগায়, ব্যাঘ্রের হিংসায়, বাউল ভালুকের ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রায় তোমার পরম প্রাণ উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছে রসতরঙ্গে। বনফুলের সৌন্দর্যে প্রকাশ করো তোমার রহস্যময় সাধনা, অমৃতফলের মাধুর্যে প্রচার করো তোমার প্রাচীন বাণী। হে অরণ্য, কথা কও!

কথায় কথায় ভুলেই গেছি যে আমি শিকারীদের সঙ্গে এসেছি। আমারই আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে যে আজ রাত্রে এই শিকারযাত্রা, আমারই জন্যে যে এই আয়োজন একথা আর মনে নেই। মনেই নেই এই আয়োজনের কেন্দ্রে রয়েছে হিংসার উত্তেজনা। শিকার জুটলে আমি যে খুশি হই এমন কথা কি এরা বিশ্বাস করবে? আমি ভগবান বুদ্ধদেব নই, অহিংসা পরম ধর্ম আমার বাণী নয়, তবু জানি আজ আমার প্রাণ আনন্দে টলোমলো! আমি প্রচুর বক্‌শিশ পেয়ে গেছি, আমার চোখ ভরেছে, মন ভরেছে। আমি যদি প্রস্তাব করি, এই মৃত্তিকার শয্যায় শুয়ে উপরে ওই আকাশ আর তারা আর অরণ্যের দিকে নীরবে চেয়ে থাকবো, তবে আমার সঙ্গীদের মেজাজ কেমন হয়? আমার সেই কাঁটা-লতার শয্যার চারিপাশে যদি ব্যাঘ্র, ভল্লুক, প্যান্থর, লেপার্ড, বন্য শূকর প্রভৃতি এসে শান্ত হয়ে বসে, যদি তারা ভুলে যায় হিংসা একটি মুহূর্তের জন্যে, যদি দৈবাৎ আমি তাদের সেই বিচিত্র ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তবে কেমন হয়? এই ত আমি সকলের পিছনে রয়েছি, যদি গা ঢাকা দিয়ে একটা ঝোপের পাশে স'রে দাঁড়াই? ওরা খুঁজবে, হায়রাণ হবে, চীৎকার করবে, লোক মোতায়েন করবে, জঙ্গল ঘেরাও করবে,—অবশেষে পুলিসে খবর দেবে। কিন্তু খুঁজে পাবে না কোনোদিন। দেখতে দেখতে আমার নতুন জীবন আরম্ভ হয়ে গেল! শাসন আর সন্দেহ থেকে মুক্ত,

নীতি আর তুর্নীতির অত্যাচার থেকে উত্তীর্ণ, সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কহীন, মানব পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, মাথায় জটা, ভুজঙ্গ-ভূষণ, বৃষভ বাহন, হাতে শিঙা, করোটির কমণ্ডলু, স্খলিত চরণক্ষেপ, অরণ্যের নেশায় নিমীলিত নেত্র !

পথের দিশা নেই, অন্ধকার থেকে চলেছি অন্ধকারে। সকলেই আমরা অন্ধ কিন্তু ইমাম আলীর চোখ তুটো জ্বলছে দপ দপ ক'রে। সে একজন গুণী, কারণ অন্ধকারে সে দেখতে পায়। দিনের বেলায় সে ঘুমায়, রাত্রে জাগে। জানোয়াররাও তাই। রাত্রেই তারা বেশীর ভাগ আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। ইমাম আলী শিকারের নেশায় আবাল্য উন্মত্ত। জন্তু আবিষ্কার করায় তার আনন্দ, হত্যা করায় নয়। স্পটলাইটের আলোয় জন্তুর চক্ষুকে দিশেহারা ক'রে দিতে সমগ্র গয়া জেলায় তার আর জুড়ি নেই। সে বকশিশও চায় না, অনুগ্রহও চায় না; তোশামোদও করে না, বিরক্তও হয় না। ইমাম আলী অদ্ভুত মানুষ। তার পাশে দাতু। তিনিও বিচিত্র। সম্ভোগে থাকা তাঁর অভ্যাস, বাবু-ফ্যাশানের মানুষ, কেয়ারি-করা চুল, মোটর বিহারী, ধনী-বন্ধুবিলাসী—অথচ কাব্যপ্রবণ, স্নেহশীল, সঙ্গীত-পিপাসু, কৃষ্ণকীর্তন ও ভজনে আসক্ত। কিন্তু হিংসা থাকে কোথায় তাঁর মধ্যে থাবা পেতে লুকিয়ে, খুঁচিয়ে জাগালে আর রক্ষা নেই তখন সব খোলস খ'সে গেল ; ছুটলেন তিনি জলা-জঙ্গলে-নদীতে-পর্বতে অভ্যস্ত জীবনকে ছিন্নভিন্ন ক'রে। তিনি সাতচল্লিশ বছরের তরুণ। তাঁর অটোক্রাট চরিত্রটা জঙ্গলের জানোয়ারকে যেন শাসন করতে ছুটে যায় দয়ার আড়ম্বরটা তাঁর সামান্য নয়, হিংসার আড়ম্বরটাও অসামান্য।

কিন্তু আমি কে ? আমি কী ? আমি কি মানুষ, না ব্যক্তি ? কেন আমার এই বহুবৈচিত্র্যর লোভ ? কেন আমার প্রাণের ভিতর গঙ্গার প্রবাহ চলে বিচিত্র ঊর্মিমালায় ? কেন ভালোবাসিনে সেই বস্তু যা ভালো লাগে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে এলাম এই অরণ্যে, তবে কেন জানোয়ারের প্রতি এই স্নুলভ মমত্ববোধ ? তবে কি পুরুষের ভিতরে থাকে এক তুরন্ত সন্ন্যাসী মানে না বাধা, মানে না বিরোধ—আপন প্রাণ, আপন জীবন, আপন সৃষ্টিকে সে ডিঙিয়ে চলে ! হিংসার বিপরীতটা কী ? প্রেম ! অমাবস্যার অপর

দিক—পূর্ণিমা! তবে কি একটি পলকে উল্‌টে দিতে পারি আজকের এই শিকারযাত্রা? বন্দুক আর রাইফেল ফেলে দাও। আমরা সবাই চলেছি তীর্থপথে। হিংসা আর হানাহানির অন্ধকারে প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেকে সীমাবদ্ধ, প্রবৃত্তির জানোয়ারগুলো নানা চেহারায় চ'রে বেড়ায়, আক্রমণের সুবিধা খোঁজে, নখর শানায়; কিন্তু হঠাৎ সূর্য জ্ব'লে উঠুক, আশা আর আশীর্বাদের আলোয় আমরা পরস্পরকে অভিনন্দিত করি, আপন জনকে সহজেই চিনে নিতে পারি। অন্ধকারে বিচ্ছেদ, আলোয় মিলন!

তবু কথাটা রয়ে গেল দলের মধ্যে আমি কে? আমি গল্পলেখক না, দার্শনিক না, শিকারীও না। দুই হাতে জঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে চলেছি জানোয়ার হত্যার আশায়, পায়ের তলায় যদি এখনি 'রয়াল বেঙ্গল' রক্তাক্ত অবস্থায় মারা পড়ে তবে সত্যই উল্লসিত হই। তবে কি আমার মজ্জাগত বৈষ্ণবীপনাটা এতই হাস্যকর? হয়ত তাই। শক্তিধর স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসকে বুঝতে পারি, কিন্তু দুর্বলের বৈরাগ্য কেমন? ভিখারীর ত্যাগ, অশক্তের অহিংসা, দুর্বলের সংগ্রাম-বিমুখতা—এদের মধ্যে কি নেই মনুষ্যত্বের দৈন্য? জীবনে যারা বিপদকে বরণ করেনি, দুর্গমের দিকে নিজেদের টেনে নিয়ে যায়নি, দুঃসাহসের পরীক্ষাকে যারা সযত্নে এড়িয়ে চলেছে, তাদের মানুষ বলতে পারিনে। বৈষ্ণবী কৃপায় করুণ আমার মন, স্নেহ মমতায় নারীকেও লজ্জা দিতে পারি, আধ্যাত্মিক বুক্‌নিতে ভাড়াটে মিশনারীও আমার কাছে হার মানে, নিরানব্বইটি বাঙালীর মতো আমিও প্রবৃত্তি চালিত। আমার মস্তিষ্কটা পুরুষের, হৃদয়টা নারীর, বাদবাকি অংশটা জানোয়ারের! নীচের তলায় গার্হস্থ্য জীবন, মাঝের তলায় সাহিত্য আর সমাজ আর রাষ্ট্রচিন্তা, উপর তলায় বিশ্ব-সমস্যা আর আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি। যেমন নাগরাজ হিমালয়। তার পাদমূলে অরণ্যবাসী জীবজন্তু, মধ্যদেশে অসংখ্য জনপদ, তার উপরে গৌরীশৃঙ্গ—মহাবিশ্বের দিকে চিরজাগ্রত শিবনেত্র।

মাঝপথে দাদু একবার থমকে দাঁড়ালেন। কাছাকাছি পৌঁছতেই কানে কানে চুপি চুপি বললেন, শুনতে পাচ্ছ?

তাঁর গলার আওয়াজে যেন অজগর সর্পের নিশ্বাস শুনলাম। মুখ তুললাম আমার চোখের তারার ভাষায় তাঁকে প্রশ্ন করলাম। তিনি ইঙ্গিতে বললেন, দূরে অস্পষ্ট গর্জন! কাছাকাছি এসেছি। ভয় পেয়ো না, কঠিন ক'রে হাঁটো।

তাঁর কথায় সেদিনকার ঘটনাটা মনে প'ড়ে গেল। এম-এ পাশ করা একটি বাঙালীর ছেলে রজৌলির জঙ্গলে এসেছিল শিকার করতে। সাহসী, বলশালী, পরিশ্রমী এক তরুণ। সঙ্গে ছিল লোকজন। তিন দিক থেকে জঙ্গল 'বীট' করা হলো। ছেলেটি উঁচু মাচার উপরে ব'সে ছিল। এমন সময়ে সেই পথে এলো বাঘ। ছেলেটির হাতে রাইফেল ছিল, বাঘ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গর্জন ক'রে উঠলো। কয়েকটি মুহূর্ত, তারপরেই গুড়ুম! সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভিতরে ঝটাপট শব্দ, সম্ভবত আহত ব্যাঘ্র পালিয়ে গেলে। কিছুক্ষণ পরে সাড়াশব্দ না পেয়ে লোকজন এসে দাঁড়ালো। দেখা গেল, রাইফেলটা মাচার নীচে জঙ্গলের উপরে প'ড়ে রয়েছে, ছেলেটির আধখানা দেহ মাচার ধারে ঝুলছে! সবাই গিয়ে তাকে ধ'রে নামালো, সে তখন বিড় বিড় ক'রে কী যেন বক্‌ছে! শহরে এনে হাসপাতালে পরীক্ষা করা হোলো—ছোক্‌রার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! চোখের সুমুখে বন্য ব্যাঘ্রের হুঙ্কার তার স্নায়ুতন্ত্রকে আতঙ্কে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছিল , সেই অবস্থায় তার হাতে থেকে রাইফেলটা খসে গিয়ে কেমন ক'রে না জানি আপনা আপনি-আওয়াজ হয়ে যায়! বাস্তবিক, ভয়ার্ত ব্যাঘ্রের অরণ্যবিদারী গর্জন কাছ থেকে বরদাস্ত করা অসামান্য শক্তিমত্তার প্রয়োজন। ভগবতীপ্রসাদের কাছে শুনেছি, একজন সাহেবেরও এই অবস্থা ঘটে; তিনি পাগল হননি বটে তবে পঁচিশ গজ দূরে বাঘকে দেখেই তাঁর পরনের হাফ্‌প্যান্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল! সেই বাঘকে হত্যা করেন পার্শ্বোপবিষ্ট ভগবতীপ্রসাদ; কিন্তু গোপন বন্দোবস্ত অনুযায়ী মিষ্টার এক্স্‌-এর নামেই সেটা চ'লে গেছে! অপর একজন মেয়ে-শিকারীর শিকার-কাহিনী আমার মনে পড়ছে। তিনি বাঘ মারতে ঢুকেছিলেন জঙ্গলে! দিনের বেলা কিছু কিছু আলোও ছিল। কিন্তু অপরাহ্নের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির প্রাণের সাহস স্তিমিত হয়ে এল। ইংরেজ মেয়ে হ'লে হবে কি, বাঘের কোনো জাতি বিচার নেই। যুবতীর বক্ষ-

স্পন্দন দ্রুত বেড়ে চললো। অপরাহ্ণ থেকে সন্ধ্যা। হাতের বন্দুক হাতের মধ্যেই ভয়ে কাঁপছে। অর্থাৎ এই পর্য্যন্ত মেয়েমানুষ হলেও চলে, এর পরে পুরুষের দরকার। এমন সময় কোথায় যেন অস্পষ্ট গর্জন শোনা গেল। মেয়েটি গলার কান্না চেপে বললে, বন্দুকটা ঠিক আছে ত? বাঘ আমি মারবোই। ভগবতীপ্রসাদ বললেন, তুমি অত কাঁপলে ত বাঘ মারা যাবে না।

ইংরাজজাতির সম্মান তখন বিপন্ন। মেয়েটি তখন বললে, আমাকে একটা গাছে চড়িয়ে দাও। না, না, হাঁটতে আমি আর পারবো না। পায়ে বড় ব্যথা।

তবে?

নতমস্তকে তরুণী বললে, কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে পারবে না?

অগত্যা নিরুপায়। তখন আর লৌকিক নীতি মানতে গেলে চলে না। বাঘের জঙ্গল। ভগবতীপ্রসাদ মেয়েটিকে পিঠের উপর নিলেন। বলাবাহুল্য তাঁর স্কন্ধদেশ ছাড়া আর কোন গাছ মেয়েটির পছন্দ হলো না। তার অর্থ, কাঁধ থেকে নামতে আর সাহস নেই। চার মাইল পথ এই ভাবে অন্ধকারে অতিক্রম ক'রে ভগবতীপ্রসাদ তরুণীকে কাঁধে নিয়ে গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হলেন। মেয়েটি ওঁকে যাবার সময় বলে গেল, তুমি কোনো কাজের নও।

খানিকটা অবকাশ পাওয়া গেল, অরণ্যের ঘনিষ্ঠতা এদিকে কিছু কম। কোথায় যেন মহিষ আছে, তার গলায় ঘণ্টার টুং টুং শব্দ কানে আসছে। আমরা ধারালো দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করতে করতে এগিয়ে চলেছি। কাছেই ছোটখাটো আর একটা অড়হরের ক্ষেত পাওয়া গেল; অর্থাৎ লোকালয় আছে। চারি-দিক বেষ্টন ক'রে পার্বত্য অরণ্য, মধ্যস্থলে এই ক্ষেতখণ্ড। ছায়ার মতো আমাদের নিঃশব্দ গতি, ক্ষেতের চারার জটলার ভিতরে আত্মগোপন ক'রে চলেছি। দূরের গর্জন আর শোনা যাচ্ছে না। কালো রাত্রি দিগ্‌দিগন্তে সাঁ সাঁ করছে।

ইমাম আলী হঠাৎ একটা ইঙ্গিত জানালো। মার্চ করা সৈন্যদলের মতো আমরা সবাই মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পলকের ভিতরে রাইফেল ও বন্দুক উদগ্র! ইমাম আলী জানোয়ারের গন্ধে সজাগ হয়েছে। কোথায়

জানোয়ার ? কোন্ দিকে ? কোন্ পথে ? ইমাম আলী কি যাদুবিদ্যা জানে ? অন্ধকারে কী উপায়ে সে জন্তু আবিষ্কার করে ?

স্পটলাইটের নির্ভুল রশ্মি গিয়ে পড়লো অড়হর ক্ষেতের মর্মস্থলে। আমার সমস্ত প্রাণ, সমস্ত রক্ত উঠে এলো চোখের তারায়। দেখলাম, মাত্র কুড়ি গজ দূরে তিনটি হরিণ অড়হরের পাতা চিবোচ্ছে। আঃ, এমন দুর্লভ দৃশ্য জীবনে দেখিনি! আলিপুরের অথবা লাহোরের চিড়িয়াখানার আধমরা হরিণ নয়, দিল্লী থেকে রাজপুতনার পথে মাঠে-চরা হরিণ নয়,—অরণ্যের হরিণ, পীতাভ নীল, সর্বাঙ্গে শ্বেতচক্র, কালো চোখে কাজলের রেখা টানা, কপালে শৃঙ্গশাখা—প্রাণময়, চঞ্চল, সুন্দর! ওরা যেন অরণ্যের প্রাণমূর্তি, যেন সকল স্বপ্ন, রহস্য ও বৈচিত্র্যের ওরা জীবন্ত প্রতীক্।

গুড়ুম!!

মৃত্যুর ঝলকে আন্দোলিত হয়ে উঠলো আকাশের তারকার দল, অরণ্যের নিবিড় নিস্তব্ধতা, বনদেবীর সন্তান-বৎসল হৃদয়! যেন বন্দুকের টোটা তার অব্যর্থ সন্ধান ভুলে উল্‌টো পথে আমারই বুকে এসে বিঁধলো। মৃত্যুর আগে নিরপরাধ হরিণ যেন আমারই কাছে করুণ কণ্ঠে তার শেষ আবেদন জানিয়ে গেল। নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে সেই মুহূর্তে নিজের মনে প্রতিজ্ঞা করলাম,—শিকারের জন্য আর আসবো না অরণ্যে!

না, হরিণ মরেনি, কাঁচা শিকারীর হাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। টর্চের আলোয় কিছুক্ষণ রক্তের চিহ্ন খোঁজাখুঁজি করা হোলো, কিন্তু বৃথা; হরিণগুলি অক্ষত অবস্থা-তেই পালিয়ে গেছে! সঙ্গীরা সকলেই ক্ষুণ্ণ হোলো, আমি নীরবে দাদুকে ধন্যবাদ জানালাম।

Can't you try God ?

বিজ্ঞানের এত উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু কই, যে-বস্তু সকলের চেয়ে বেশি দরকার, তাকে কেমন ক'রে পাওয়া যায়। সুইচ্ টিপলে আলো জ্বলে, কল ঘোরালে আকাশে ওড়ে মানুষ, রেকর্ড প্লেটে কণ্ঠস্বরকে বন্দী ক'রে রাখা যায়, টেলিভিশনে ছবি ভেসে ওঠে,—এবার তবে try God! ভগবানকে আনা যায় না কোনো বিজ্ঞানের কৌশলে ? এমন রাইফেল নেই যার বুলেট

ছুটে গিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করে? সর্বশেষ বিজ্ঞানের আবিষ্কার কী? কোন্ অস্ত্রের অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে? এবার আবিষ্কার হোক ভগবান!

জনকপুর জঙ্গলে প্রবেশ করেছি। পথ অতি সঙ্কীর্ণ; অনেকদিন বোধ করি এদিকে মানুষের সমাগম হয়নি, লতাপাতা আর আগাছায় পথ বুজে গেছে। আমাদের গাড়ীখানা যেন এক অদৃশ্য সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে এসেছে। সম্মুখে, পিছনে সমস্তই একাকার; কেবল গাড়ীর হেড্ লাইটের আলোর আভায় পথের দুই পাশে অরণ্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর চলেছে। এটা বাঘের জঙ্গল—ইমাম আলী জানিয়েছে। কথাটা মিথ্যা ব'লে মনে হলো না। আগের জঙ্গলে স্পটলাইটের আলো সহস্র সহস্র উজ্জ্বল মণি-মাণিক্যের মতো জন্তুগণের উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে তাদের চিহ্নও নেই। এ যেন একটা প্রাণীহীন বিচিত্র জগৎ। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, সর্প, খরগোস, শিয়াল, হরিণ,—কিছুরই চিহ্ন নেই। কিছু নেই, তার কারণ এখানে বাঘের আবাস। হরিণের দল দেখলে জানা যায়, বাঘ সেদিকে থাকে না, তেমনি বাঘ থাকে যে-জঙ্গলে সেখানে আর কোনো জন্তু প্রবেশ করে না। বাঘ বড় সাম্প্রদায়িক, হিংস্র; সে মনে করে অরণ্যটা তারই জন্য সৃষ্ট, তারই রাজ্যপাট, তারই শাসনে চলবে সব। শান্তিবাদী ভদ্র জানোয়ারের স্থান তার এলাকায় নেই। একমাত্র বানর ছাড়া আর কোনো জন্তু বাঘের জঙ্গলে পাওয়া যায় না।

বানরের কথায় সেই গল্পটা মনে প'ড়ে গেল। এইদিকেই এক জঙ্গলে 'আদমখোর' (man-eater) এক বাঘের ভয়ানক উৎপাত শুরু হয়। অনেকগুলি চাষী আর জংলীকে হত্যা করেছে। মানুষের রক্ত মাংস খাবার পর আর কোনো জন্তুর প্রতি ব্যাঘ্রের আসক্তি থাকে না; কারণ মানুষের রক্ত ও মাংস অতি সুস্বাদু—dilicious! অতএব 'আদমখোর' বড় ভয়ংকর। তাকে ধ্বংস করতেই হবে। যাই হোক, সেই বাঘটাকে শিকার করবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। বড় বড় শিকারী এসে হাজির। ইব্রাহিম নামক এক বৃদ্ধ মুসলমান পথ-প্রদর্শন ক'রে একে একে প্রত্যেকটি শিকারীকে সেই জঙ্গলের ভিতরে

রেখে এলো। প্রত্যেকবার একজন মাত্র। কিন্তু ওই পর্যন্তই, পরের দিন দেখা যায় শিকারীর ছিন্নভিন্ন দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত! এই ভাবে পাঁচ ছয় জন নামজাদা শিকারী প্রাণ দেয়; বাঘের উৎপাত বাড়তে থাকে।

সরকার ঘোষণা করলেন, হাজার টাকা পুরস্কার!

তখন একজন সাহেব এলেন। ইব্রাহিমকে খবর দেওয়া হোলো। ইব্রাহিম এসে বললে, তোমার মতন চার পাঁচ জন সাহেব প্রাণ দিয়ে গেছে, হাজার টাকার লোভে কেন প্রাণ দিতে যাবে? ওহে ইংরাজ, বাড়ী ফিরে যাও!

সাহেব নাছোড়বান্দা। সুতরাং ইব্রাহিম তাকে পথ দেখিয়ে সেই বিশেষ জঙ্গলটার দিকে ছেড়ে দিয়ে এলো। সাহেব একাই অরণ্যে প্রবেশ করলেন। বেলা অপরাহ্ণ। আকাশের পশ্চিমে সূর্য, কিন্তু নীচে অরণ্যে তখনই অন্ধকার পাকাচ্ছে। সাহেব ভীত দৃষ্টিতে চারিদিকে লক্ষ্য করলেন। প্রাণী কোথাও নেই—কীট, পতঙ্গ, শৃগাল, বনকুকুর, হরিণ—কোথাও কিছু নেই। তিনি দেখলেন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এক একটা নরকপাল, কোথাও কোথাও চর্বিত মনুষ্যকঙ্কাল, কোথাও শুকনো রক্তের দাগ। চলতে চলতে দেখা গেল, এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড গর্ত। বোঝা গেল, শিকারীরা এই গর্তের ভিতরে নেমে লুকিয়ে বাঘের দিকে লক্ষ্য রাখতো। কেউ মাচায় ওঠে, কেউ গর্তে নামে। সাহেব তাঁর রাইফেলটা বাগিয়ে ধ'রে অসীম সাহসে সেই গর্তের ভিতরে নামলেন। তাঁর বুঝতে আর বাকি রইল না যে, বাঘ এইখানেই আসে। নিকটেই ছোট একটি জলাশয়। অরণ্যের জলাশয় বিপজ্জনক!

এমন সময় হঠাৎ একটি বানর লাফাতে লাফাতে এলো, একবার সাহেবকে লক্ষ্য করলো, তার পরেই তীব্রকণ্ঠে সে চীৎকার ক'রে উঠলো। লক্ষণটা ভালো নয়। সন্দেহক্রমে সাহেব গর্তের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি উঠে নিকটবর্তী এক গাছের ডালে আরোহণ করলেন। তারপর কয়েকটি মুহূর্ত দেখতে দেখতে এক বিশালাকায় ব্যাঘ্র ছুটে এসে সেই গর্তের ভিতরে লাফ দিল। একটি নিমেষ! পর মুহূর্তেই গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

তিন গুলীতে ব্যাঘ্রের মৃত্যু!

বানরটার হঠাৎ প্রতিহিংসাবৃত্তি জেগে উঠলো। সাহেবকে সে আক্রমণ করবার জন্য দৌড়ে এলো। বটে, বানরের এত বড় স্পর্ধা!

গুড়ুম!—এক গুলীতেই বানর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখা। তখন লোক-লস্কর নিয়ে সেই বাঘ ও বানরের মৃতদেহ তুলে আনা হলো। পরদিন ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল, বাঘটা ছিল অন্ধ। প্রকৃতির অদ্ভুত রহস্যযোগে বানরটার সঙ্গে ছিল অন্ধ ব্যাঘ্রের বন্ধুত্ব। দুইজনের ষড়যন্ত্রে অতগুলি শিকারীর প্রাণ গেছে! সাহেবের ডায়েরিতে এই বিচিত্র বন্ধুত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস লেখা আছে। প্রকৃতির ভাষা মানুষের নিকট চিরদিনই দুর্জ্ঞেয়।

অসাড় অবশ অবস্থায় ব'সে আছি। শীতের ঠাণ্ডায় গরম কাপড়-চোপড়ের ভিতর থেকেও হাত-পাগুলো জ'মে গেছে। চক্ষু আমাদের সজাগ। শোনা গেল, তিরিশ মাইলের ভিতরেও এখানে লোকালয় নেই। ভয়ে, সাহসে, আনন্দে, কৌতূহলে মনের অবস্থাটা জটিল। দুই পাশে অরণ্য এতই উঁচু যে, হঠাৎ কোনো জানোয়ার অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করলে প্রাণ বাঁচানো কঠিন। এমন ঘটনা অনেকবার ঘটেছে,—গাড়ীর ভিতর থেকে মানুষ তুলে নিয়ে বাঘ পালিয়েছে। গাড়ীর হেডলাইটের রশ্মি দশ পনেরো গজের বেশি দূরে আর যায় না—তার বাইরে সমস্তই আমাদের কাছে অজানা। পথের নানা বাঁক, নানা বাধা, নানান্ সমস্যা। মাঝে মাঝে ঝিল্লিরব, কোথাও কোনো কীট কোন্ অলক্ষ্য বৃক্ষের মর্মস্থলে দাঁত বসিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছে—তারই একঘেয়ে শব্দ; কোনো পাখীর ডানার একটা ঝাপটা, কোথাও শুকনো পাতার ভিতর দিয়ে গিরগিটির সর্‌সরানি। মাত্র এতটুকু, আর সমস্তই নিঃশব্দতার সমুদ্রের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত; বন্দুকের গুলীও বোধহয় সেই নীরবতাকে ভেদ করতে অক্ষম।

তবু একসময় ফুলের গন্ধে ফিরে পেলাম আমার পরিচিত পৃথিবীকে। আমি অরণ্যে, কিন্তু বোধকরি মরজগতেরই প্রতিষ্ঠিত আছি। একদা ভীষণ ভয়াল সমুদ্র-তরঙ্গের বিচিত্র গন্ধ আমি প্রাণ পেতে আঘ্রাণ করেছিলাম—বঙ্গোপসাগরের মধ্যে সে এক ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ রাত্রির ইতিহাস; তারপরে এক নূতন গন্ধ পেয়েছিলাম দুর্গম হিমালয়ের চিরতুষারময় মহাতীর্থে; আজ

গন্ধ পাচ্ছিলাম চিররহস্যময় অরণ্যের—শিকড়ের সঙ্গে মৃত্তিকার, বৃক্ষকোটরের সঙ্গে সর্পদেহের, লতাপাতার সঙ্গে পাখীর ডানার, শাখাপ্রশাখার সঙ্গে জড়ানো জন্তুর নিশ্বাসের। যেন এই অরণ্যের জটায় জটায় বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীনের গন্ধ, যেন পৌরাণিক যুগের তপস্বীগণের গাত্রাবাসের গন্ধ,—মৃত্যুর পরপারে যেন কোন্ অজানা জীবনের গন্ধ। ফুলের গন্ধেও সেই কথা। একে আস্বাদ করিনি লোকালয়ের লোকযাত্রায়, এ ফুল ফোটে না কোনো উদ্যানে, এ ফুল নয় পৃথিবীর। এর পর কি পাবো সেই সামগান-মুখরিত প্রাচীন তপোবন, বল্কলধারী সন্ন্যাসীর দল? যাদের আশ্রমপ্রান্তে পাবো ব্যাঘ্র আর হরিণের সমন্বয়, হিংসা ও অহিংসার নিবিড় যোগসূত্র, সংহার ও শান্তির পরম সঙ্গম? এই গন্ধ কি আমাদের সেই পথে নিয়ে যাবে?

সেই পথে যাওয়া যায় না, যে-পথে ঈশ্বরকে পাবো? জানোয়ারের প্রাণ নয়, মানুষের হৃদয় নয়, নারীর প্রেম নয়,—নির্ভুল, অব্যর্থ ঈশ্বরকে। যোগসাধনা মন্ত্র তন্ত্র তথাকথিত গেরুয়াধারীর বৈরাগ্য—কিছু নয়—যাকে পাবো একাগ্র লালসা-কামনার রক্তযজ্ঞে, যাকে পাবো প্রাণের সুস্পষ্ট মোহ মদমত্ততার অগ্নিরসের মন্থনে। কে দিল আমার ভিতরে হিংসা, কে পাঠালো এই অরণ্যে প্রাণীসংহারে, কে নিয়ে গেছে আমাকে বারে বারে দুর্য্যোগ থেকে দুর্গমে,—সে কি ঈশ্বর নয়? তার মর্মান্তিক খেলায় আমি যে প্রাণহীন স্বাতন্ত্র্যহীন ক্রীড়নক; কী খেলা সে খেলালো তারই দেওয়া জীবন নিয়ে? আমার হাতে জানোয়ার মরবে একবার, ঈশ্বরের হাতে আমি বার বার! জননীর জঠরে সে মারে, সে মারে দারিদ্র্যের দৈন্যে, দুঃখে, বেদনায়; সে মারে প্রণয়-লীলায়, বাৎসল্যে; সে মারে ভোগে নিমজ্জমান অবস্থায়, সে মারে সুখের অবিমিশ্র অন্ধতায়। তবু এতেই হবে, যা আছে তাই কুড়িয়ে একত্র করা যাক্। এই ভাঙাচোরা, তচনচকরা, প্রবৃত্তির নানা অনাচারে জীর্ণ, বাসনার ঝড়ে বিধ্বস্ত,—এই প্রাণটাকে নিয়েই এসো,—let us try God! পাপে লিপ্ত হই, অন্যায়ে ডুবে যাই, সম্ভোগে ক্ষয় হ'তে থাকি, লজ্জায় আর অপমানে মাথা হেঁট করি,—কিন্তু মানুষটা থাকে শেষ অবধি। তার গায়ে কাদা লাগে না, নানা অবস্থায় তার পুনর্জন্ম হয় বার বার।

সে বলে, আমি তেমনি অতৃপ্ত, তেমনি সন্ধান করে ফিরছি সেই দুষ্প্রাপ্য বস্তুকে। আমি ছিলুম বালক, ছিলুম যুবা, ছিলুম প্রৌঢ়, এখন আমার বার্ধক্য,—চেয়ে দেখছি সেই আমি এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে উত্তীর্ণ হয়ে আসছি; সেই আমার মন; সেই আমার প্রাণ, আমি সেই এক অথচ বহু; কিন্তু মৃত্যুর পরপারে গিয়েও যদি দেখি আমি তেমনি আছি, আমার মৃত্যু ঘটেনি,—দেহটাই কেবলমাত্র ভস্মীভূত হয়েছে,—তবে? সে যে বড় বিপদ! কোন্ দেহের ভেলায় চ'ড়ে আবার আসবো নবজীবনের ঘাটে? আবার দেহ যদি না পাই?

এই প্রশ্নের সমাধান হবে, আগে ঈশ্বরকে চেষ্টা করা যাক্। সেই অরণ্যে যাবো যেখানকার একমাত্র জানোয়ার—ঈশ্বর! আমার এই অগ্নিগর্ভ প্রাণের অস্ত্র দিয়ে অব্যর্থ সন্ধানকরবো সেই ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতি। তার আগে প্রবৃত্তির গাড়ীখানা সেই দিকে ঘোরাই, চিন্তার সেই জটিল পথের বাঁকে।

চুপ ক'রে আছি পরম বিস্ময়ে, অরণ্য কানে কানে কথা ব'লে চলেছে। মানুষের জীবন কি এক গহন অরণ্য নয়? তার পদমূলে জন্তু জানোয়ার, হৃদয়ের ভিতরে পাখীর কলকূজন, তার শীর্ষদেশে লক্ষমণিখচিত সৌরভ মণ্ডলের অনন্ত স্বপন-লোক। লতায়-পাতায়, শিরায়-শিরায় জড়ানো কোন কথা; ডগায় ডগায়, মজ্জায় মজ্জায় জড়ানো কোন্ ভাষা; শিকড়ে শিকড়ে অস্থিতে-অস্থিতে জড়ানো কোন্ বাণী? ব্যাঘ্রের গর্জনে, বায়ুর স্বননে, পাখীর কূজনে, ফুলের সুবাসে, সাপের নিঃশ্বাসে, মৌমাছির পাখায়, মৃত্তিকার আত্মায়,—অরণ্যের প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে! এই যে আশ্চর্য সমন্বয়—এরই নাম কি ঈশ্বর? ঈশ্বর মানে কি পরম ঐক্য, পরমতম perfection?

অরণ্য যেন কানে কানে বললে, আমার জীবন, আমার মরণ কা'র হাতে বাঁধা? অগণ্য প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত ইতিহাস কে রচনা ক'রে চলেছে? বসন্তকালের দুর্জয় নবযৌবন কেবল-মাত্র আমার জরাকে ঘুচিয়ে দিয়ে যায়—কিন্তু আমার ধ্বংস ও সৃষ্টির রহস্য সে কেমন ক'রে জানবে? মানুষের অস্ত্রের আঘাতে আমার প্রাণক্ষয় হয় না, ওরে মূঢ়, মহাকালের প্রলয়-লীলায় আমি কেবল ধ্বংস হই!

মনে মনে বললাম, হে প্রাচীন, অপরাধ ক্ষমা করো। আমিও মরতে চাই, কিন্তু মানুষের হাতে নয়, দানবের হাতে নয়, অপমান-দুঃখ-বেদনার হাতে নয়, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য-সম্ভোগ পাপ-পুণ্য-প্রবৃত্তি ঘৃণা-লজ্জা আর ভয়ের হাতেও নয়—আমিও ধ্বংস হ'তে চাই সেই প্রলয়-লীলায়,—সেই মহাকাল, সেই আমার ঈশ্বরের হাতে!

পাটনা থেকে নওয়াদা মোটরে প্রায় আশী মাইল পথ। যখন আমরা যাত্রা করলাম বেলা তখন একটা। বৈশাখের শেষ, শুষ্ক রুক্ষ বিহারের দিক্-দিগন্তব্যাপী সূর্য জ্বলছে। পাটনা ও দানাপুরের পথ দিয়ে ত্রিশ মাইল অতিক্রম ক'রে বখতিয়ারপুর পার হলাম। যথারীতি তেওয়ারী আমাদের গাড়ী চালিয়ে চলেছে। তার পাশে আছে শ্যামলাল—তার জিম্মায় প্রথা অনুসারে আমাদের আহারাদির সরঞ্জাম। তার পাশে কমল—দাদুর ভ্রাতুষ্পুত্র। কিছুকাল অবিচ্ছিন্ন তপস্যা করা গেছে; ধর্মালোচনা করেছি, ভগবানকে ডেকেছি,—এবারে আবার ডাক এসেছে অরণ্য থেকে। কোনো নীতিতেই মনকে স্থায়ীভাবে বন্দী রাখা চলবে না,—গতি না পেলেই তার দুর্গতি; বদ্ধ জলায় রোগের বীজাণু জন্মায় কে না জানে! পাটনায় দাদুর প্রাসাদ প্রাসাদে এতদিন ব'সে নিজের ভিতরকার স্বেচ্ছাচারী দুরন্তকে ভুলে ছিলাম; আজ যেন মনে হোলো লোহার শিকল ভেঙে দুর্জয় আনন্দে আবার পথে নেমে এসেছি! সাহিত্য নিয়ে ছিল আমাদের বিতর্ক, ধর্ম নিয়ে ছিল বচসা সমাজ নিয়ে ছিল বিবাদ। আমার কথাবার্তা সাধারণত আক্রমণমূলক ও দুর্নীতিঘেঁষা; মানুষের চরিত্রের পরম বিকাশের জন্য সব রকমের নীতিকেই আমি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত —এই নিয়ে দাদুর সঙ্গে আমার ঘাতপ্রতিঘাত। তিনি চরিত্রের শুচিতা মানেন, নির্মল প্রেম মানেন, আদর্শবাদ মানেন এবং সকলের চেয়ে বিপদ,—নীতিবাদ মানেন। তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর ভীষণ বিতৃষ্ণা কারণ তারা যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেয়; একনিষ্ঠাহীন প্রণয়ের প্রতি তাঁর বিজাতীয় ঘৃণা, কারণ এর মধ্যে সমাজ ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত। বিশেষ

একটা মতবাদ আর এক-দেশদর্শী নীতিবোধে মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করলে প্রগতিমূলক চিন্তার পথ রুদ্ধ হয় একথা তাঁকে বোঝানো কঠিন। সৃজনের কাজ যাদের হাতে, অন্তরে বাহিরে তারা চায় মুক্তি; শিল্পর আনন্দ স্বেচ্ছাচারে, অবাধ স্বাধীনতায়, বাধাবন্ধনহীন জীবন-প্রবাহে। কিন্তু শিল্পর চরিত্র-আলোচনা এখন থাক্।

বখ্‌তিয়ারপুরের পথ দিয়ে বিহার-শরিফের দিকে আমাদের মোটর ছুটছে। বাঁ-দিকে শীর্ণ একটা রেলপথ রাজগৃহ নালন্দার দিকে গেছে, চারদিকে সূর্যজ্বালা-জ্বলন্ত প্রান্তর, মাঝে মাঝে চাষীদের ছোট ছোট গ্রাম। বাংলা দেশের মতো কোমল মৃত্তিকা এদিকে দুর্লভ, পথের আশেপাশে ঘন দূর্বাদলের শ্যামশ্রীর বড় অভাব,—সহজে কোথাও জলাশয় চোখে পড়ে না। রুক্ষ বাতাসে দূর-দূরান্তর ধূলায়-ধূলায় আচ্ছন্ন। এমন অদ্ভুত গ্রীষ্মপ্রাধান্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে কিনা কে জানে। থাকলে তাদের দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশের পরাধীনতার বড় একটা কারণ, গ্রীষ্মাধিক্য। শীতপ্রধান দেশ থেকে বৈদেশিক শক্তি বার বার এসে আমাদের শাসন ও শোষণ করেছে। শীত মানে উদ্যম আর উৎসাহ, গ্রীষ্ম মানে জড়তা আর নিদ্রা। শীতের দিনে আমাদের দেশে কর্মশক্তি জাগ্রত হয়, কন্‌গ্রেস করি, সভাসমিতি বসাই, সাহিত্য সম্মেলন ডাকি, নাচ গানের আড্ডা জমাই, পেট ভ'রে খাই। শীতে ধান কাটি, গ্রীষ্মে ঘরে ব'সে থাকি। সত্য বলতে কি, শীত মানে যৌবন, গ্রীষ্ম মানে জরা। শীতপ্রধান দেশে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঘটে অকাল মৃত্যু। শীতের দেশে যারা বেকার, তারা অন্ন-সংস্থানের জন্য যুদ্ধ করে, বিপ্লব বাধায়, উপবাসের প্রতিশোধ নেয়; গ্রীষ্মদেশের বেকাররা খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরে, কাঁদে অথবা আত্মঘাতী হয়। শীতের দেশে মেয়েদের উনিশ বছর বয়সে স্ত্রী-চৈতন্য ঘটে, গ্রীষ্মদেশের মেয়েদের এগারোতেই 'বাড়ন্ত-গড়ন'! ওদেশের গাছে ফুল ফোটে, সে ফুল হয় দীর্ঘকাল স্থায়ী; এদেশের গাছে ফুল ফুটেই ঝরে যায়। জন্ম, যৌবন বার্ধক্য মৃত্যু,—এদেশের বড়ই দ্রুত। বিলাতের মতো বছরে দশ মাস যদি শীত আমাদের দেশে স্থায়ী হয় তবে দশ বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'তে পারে। শীতপ্রধান দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন কর্মবহুল, তেমনি দ্রুত।

গাড়ী চলছে। উত্তপ্ত বাতাসে মুখ চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে। এই বাতাস থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই—মুখে চোখে লাগলেই কেমন একটা কালো পর্দা প'ড়ে যায় চামড়ার উপর। দাদু বসেছেন ডান দিকে, বাঁ দিকে আমাদের বন্ধু ডাঃ ঘোষাল। তিনি যেমন সক্রিয়, তেমনি উৎসাহী। সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা কম নয়। ছুটতে, হাঁটতে, গাড়ী চালাতে, কথা বলতে এবং দাদুকে অঙ্গুলি হেলনে চালিত করতে তিনি খুব তৎপর। দাদুও তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে পেয়ে আনন্দিত। কমল কেবল আমাদের মধ্যে তপস্বী, সহজে সে কথা বলে না।

বিহার-শরিফে এসে পানীয় জল পাওয়া গেল, তৃষ্ণার্ত আমরা জল পান করলাম। সিগারেট চলছে অবিশ্রান্ত। কিন্তু সেদিনকার পথের দুর্যোগটা স্মরণীয়। উপর্যুপরি তিনবার মোটরের চাকার টিউব খারাপ হলো। পথের অগ্নি উত্তাপটা তার জন্য দায়ী।

কিন্তু অত রৌদ্রেও যাত্রাটা খুব ভালো লাগছে। প্রতি পদক্ষেপে নূতন রাজ্য আবিষ্কার ক'রে চলা অজানা প্রান্তর আর গ্রাম অতিক্রম করা,— মুহূর্তে মুহূর্তে যেন আপন অস্তিত্বকে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছি! ভ্রমণের রহস্যই এই। প্রাণচৈতন্য কেবলই বৈচিত্র্যকে আস্বাদ ক'রে চলে, পথের প্রবাহে মনের ভাবনা রাশ আল্‌গা ক'রে দেয়। এক হাতে ছড়িয়ে দেওয়া, অন্য হাতে কুড়িয়ে নেওয়া। ভারতবর্ষটা যেন একটা দীর্ঘ রূপকথা। যত পথ তত গল্প। এর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। রাজপুত্র চলেছে ঘোড়ায়। কেন চলেছে? আবিষ্কারের নেশা। প্রান্তর পার হয়ে তেপান্তর, তারপর এলো সরোবর! উপবন এলো, তারপর এলো তপোবন। তপোবন পার হয়ে এক রাজার দেশ। রাজা, রাজা ছাড়া আর কথা নেই। রাজা-বিলাসী জাতি আমরা, রাজা নৈলে চলে না। রাজার পরে মন্ত্রী, তারপর কোটাল, তারপরে সওদাগর। রাজতন্ত্র নৈলে আমাদের আনন্দ নেই। রাজার স্নেহচ্ছায়ায় আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে চাই; রাজার অনুগ্রহ আশীর্বাদের মত মেনে নিই! আসলে রাজপ্রীতি আর রাজভক্তি আমাদের রক্তের মধ্যে, আমরা চিরকালের 'লয়াল্!' পুরাণ আর ইতিহাস ঘাঁট্‌লে দেখা যায়, ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র কোনো না কোনো এক রাজাকে কেন্দ্র ক'রে

প্রতিষ্ঠিত,—আবহমান কাল থেকে এই নিয়ম, এই নীতি। এর কারণ কি? আমরা ব্যক্তিত্বকে স্বীকার ক'রে এসেছি এতকাল। ব্যক্তির মনুষত্ব আর পরিপূর্ণতা আমাদের চোখে অনেক বড়। ধর্মে, জ্ঞান-গরিমায়, ত্যাগে, পরার্থ-পরতায় আমাদের দেশে যিনি শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছেন, তাঁকে বলি, তুমি রাজা, তুমি অধিপতি, তুমি মহাত্মা। রাজা যুধিষ্ঠির, রাজা রামচন্দ্র, রাজা অশোক, রাজা শিবাজী, রাজা প্রতাপাদিত্য। সাধারণতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র আমাদের স্বভাবে নেই, ওটা দরিদ্র ইউরোপ থেকে ধার ক'রে আনা। অনুর্বর দেশে মানুষ যেখানে সামান্য রুটি আর মাংস কাড়াকাড়ি করে খায়, জড়বাসী যে সব জাতি কেবলমাত্র বৈষয়িক বুভুক্ষা নিয়ে পরস্পর হানাহানি করে, গণতন্ত্রবাদ সেই দেশ থেকে আমদানি। ধনী ইউরোপে ধন আছে প্রচুর, ঐশ্বর্য এক ছটাকও নেই! ঈশ্বর থেকে আসে ঐশ্বর্য। ভারতবর্ষ চির ঐশ্বর্যময়ী। এই বিশাল দেশের সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিতে কোথাও দারিদ্র্য নেই, স্বার্থসন্ধানী মিথ্যাশ্রয়ীর দল প্রচার ক'রে বেড়ায়—ভারতবর্ষ দরিদ্র! বণিকের ছদ্মবেশে বিদেশী দস্যুর দল এসে ভারতের সোনা লুণ্ঠন করে, তার সৌভাগ্য, লুণ্ঠন করে তার আহার্য সম্ভার—কিন্তু ভারতের ঐশ্বর্য থাকে অটুট। এই স্বর্ণ-সীতা ভারতের যতদূর দৃষ্টি চলে, যত দেশ ভ্রমণ ক'রে বেড়াও, যত রাজ্য তুমি উত্তীর্ণ হও;—দেখবে প্রাণীন পদার্থ শস্যলক্ষ্মীর সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ, অন্নপূর্ণার অকৃপণ দাক্ষিণ্য চির অবারিত; জগতের কোটি কোটি ভিখারীর অন্নসত্র তাঁর দরজায় নিত্য উন্মুক্ত। সাধারণতন্ত্র সেই দেশে যেখানে কেবল অন্নসংগ্রাম। মানুষ যেখানে মানুষকে নিষ্ঠুর আঘাতে দলিত ক'রে, মেসিনের সঙ্গে মেসিনের সংঘাত যেখানে, যে-দেশে মানুষ অন্নের দাসত্ব করবার জন্যে ধর্মকে বিক্রয় করে, যে-দেশে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উন্নতি ঘটেছে কেবল মারণাস্ত্র সৃজনে। গণতন্ত্র মানে কী? বহুব্যক্তির হাতে শাসন-শক্তি, সকল মানুষের ঘরে সমান পরিমাণে অন্ন। কিন্তু এর চেহারাটা কেমন? শাসন করা আর অন্ন জোগানো—এই কি মানুষের পরে সুবিচার? তার হৃদয়, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, প্রাণ, স্বপ্ন, কল্পনা এসব কই? গণতন্ত্রের চাপে সর্বসাধারণের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত! ক্ষুধার খাদ্য আর ভোটাধিকার—এই কি তোমার একমাত্র কাম্য? কিন্তু আমি জানি আমার মত বদলায়।

হঠাৎ চেয়ে দেখলাম, দাত্নর মুখের উপরে 'রাজা' মুসোলিনীর ছায়া, ঘোষালের মুখের ছায়া 'রাজা' ষ্টালিনের। তুজনের হাতেই রাইফেল, তুজনেই শিকারী, তুজনেই হত্যার নেশায় মশগুল। শত্রুসংহার করতে তুজনেরই ক্রুটি ঘটবে না। একজন ফাসিষ্ট্, অন্যজন কম্যুনিষ্ট,—কিন্তু তুজনেই ডিক্‌টেটর। একজনের হাতে দল, অন্যজনের হাতে সম্প্রদায়। একজনের আদর্শ সাম্রাজ্যতন্ত্র, অন্যজনের আদর্শ সাম্যবাদ। তুই আদর্শই মানুষকে দলন করে। দেশের অভ্যন্তরে যদি এদের আদর্শের প্রতিবাদ ওঠে, উভয়েই তার টুঁটি চেপে মারে। ডিক্‌টেটরই বলো আর চ্যান্‌সেলরই বলো, ফাসিজমই বলো আর কম্যুনিজমই বলো, শক্তিমানের স্বেচ্ছাচারই পৃথিবীতে বড়ো কথা। জাতটা কেবল প্রকার ভেদ।

আকাশ ধূসর নীলাভ। মেঘের চিহ্ন কোথাও নেই। বৈরাগী প্রান্তর নিমীলিত নেত্রে ব'সে রয়েছে, মহাশূন্যে অগ্নি দেবতার জ্বলন্ত চক্ষু। চারিদিক নীরব। এত নীরব যে ধূলা-ধূসর বাতাসের শব্দ কান পেতে শোনা যায়। আমাদের মোটর চলেছে দক্ষিণে। পথের তুই পাশে বৃক্ষচ্ছায়া অতিক্রম করার সময় পরিশ্রান্ত পাখীর অলস কলকূজন শোনা যায়। এমন প্রাণের প্রাচুর্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। মৃত্তিকায় প্রাণবন্যা, জলের ভিতরে প্রাণীবহুলতা, শূন্যে কোটি কোটি প্রাণবীজাণু, বৃক্ষ-লতায় পাতায় অগণ্য প্রাণী! গ্রামে গ্রামে শহরে-শহরে, নদীতে, পর্বতে, অরণ্যে, প্রাণীর প্লাবন। উপরে সূর্য দেবতা প্রতি পলকে কোটি কোটি প্রাণ সৃজন করছেন, কোটি কোটি প্রাণ জীর্ণ করছেন। সেই বিরাট জন্ম ও মৃত্যুশালার স্নুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আমাদের যন্ত্রযান দ্রুতবেগে চলতে লাগলো।

দূরে দক্ষিণে রাজগৃহ পর্বত। অরণ্যশীর্ষ এখান থেকেই লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি গৃধ্রকুট, গৌতম-নিগ্রোধ···তার পাশে সপ্তপর্ণীগুহা, জীবকের আম্রবন চৌরপ্রপাত। কিন্তু এ যাত্রায় সেদিকে আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। গৌতম বুদ্ধের অহিংসা পরম ধর্ম আমরা পাটনার বাড়ীতে ফেলে এসেছি, এখন 'জীবহিংসা পরম ধর্ম!'

বেলা পাঁচটা নাগাদ শহর পাওয়া গেল। এক শহর অন্য শহরের অনুকরণ। নওয়াদা গয়া জেলারই একটি মহকুমা। এই মহকুমার প্রায়

তিনদিকে অরণ্য,—একটি দিক খোলা যেদিক থেকে এলাম। রাস্তা ঘাট প্রাচীনের সাক্ষ্য দেয়, কোথাও বিশেষ সংস্কারের চিহ্ন নেই। দুই তিনটা মাত্র সরকারী পথ। একদিকে সরকারী কর্মচারিগণের পাড়া, আর একদিকে আদালত-পুলিস-হাসপাতাল-ডাকঘর, অন্যদিকে বাজার। নিকটে রেল-ষ্টেশন। একটি পথ যায় গয়ার দিকে অন্যটি কিউলে। আমাদের মোটর এসে থামলো সরকারী সিভিল সার্জনের বাংলোর দরজায়।

একটি রূপবান যুবক বেরিয়ে এলেন। তিনি বাঙালী। তাঁর স্বাস্থ্যশ্রী প্রথমেই নজরে পড়ে। ঘোষাল গাড়ী থেকে নেমেই বললেন, শরবৎ কিম্বা খাবার—শিগগির। মিষ্টার সান্যাল, এটি আমার ছাত্র।

গুরু শিষ্যের সম্পর্কটি বড় মধুর। একজন সস্নেহে ধমক দেন, অন্যজন হাসিমুখে হুকুম পালন করেন। তাঁদের আলাপ আর আলোচনার ভিতর দিয়ে আমরা সোৎসাহে উদরপূর্তি করলাম।

এবার জঙ্গলের কথা। অনেকদিন আগে বাঘের বেশ উপদ্রব ছিল, দুজন দেহাতি হত হয়েছে। ভাল্লুক আর নীলগাই এদিকে প্রচুর। বনশূকর অথবা লেপার্ড অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু একটা কথা।

ঘোষাল বললেন, কি?

যুবক বললেন, পুলিসের বড় কর্তা গেছেন লোকলস্কর নিয়ে। কাল থেকেই তাঁরা জঙ্গলে। আজ বোধ হয় আপনাদের শিকার হবে না। সকালের আগে তাঁরা ফিরবেন না।

আমরা সকলে মুখ-চাওয়াচায়ি করলাম। এত পরিশ্রম তবে কি পণ্ড হবে? দাদু বললেন, নবী আক্তার কোথায়?

সে গেছে তাঁদের সঙ্গে।

কিন্তু সে ত জানে আমরা আসবো?

যুবক হেসে বললেন, পুলিসের দাবি সকলের আগে। আপনারা আজ আমার বাসায় থাকুন, কাল যাবেন জঙ্গলে।

কিন্তু সময় আমাদের বড় অল্প। কাল সমস্ত দিন নওয়াদায় থাকা, অপরাহ্ণ থেকে সমস্ত রাত্রি পর্যন্ত জঙ্গলে তারপর পুনরায় একশত মাইল ফিরে যাওয়া—এতখানি সময় আমাদের হাতে নেই।

ঘোষাল বললেন, যদি একই জঙ্গলে আমরা দু' দলই শিকার করি ?

দাদু বললেন, সেটা মন্দ নয়। তাতে জন্তুরা বাঁচবে, আমরা দু' দল অন্ধকারে গুলী মারামারি ক'রে মরবো।

কিন্তু এতদূর এসে মত বদলানো আর চলে না। আমাদের অসামান্য উৎসাহটা কেবলই জঙ্গলের দিকে ঠেলছে। যেমন ক'রেই হোক চান্স্ একটা নিতেই হবে। আজ ইমাম আলী আমাদের সঙ্গে নেই—অরণ্যের অন্ধকারে জানোয়ার আবিষ্কার করার মতো মানুষের অভাব—সুতরাং নবী আক্তারকে না পেলেই চলবে না। নবী আক্তার! নবী আক্তার! আজ তাকে আমাদের পরম প্রয়োজন। সে আছে একতারার কোন্ দুর্গম অরণ্যে। তাকে আমাদের চাই।

অপরাহ্ণের রৌদ্র স্তিমিত হোলো ; আকাশ হোলো নানারঙে রঙীন। সন্ধ্যা সমাগত। অতএব আর দেরি নয়। সকলে আমরা গাড়ীতে এসে উঠলাম। তেওয়ারি ইতিমধ্যে গাড়ীর চাকার টিউব বদলে এনেছে, আর কোন শঙ্কা নেই।

গাড়ী ছুটলো পূর্বদিকের পথ দিয়ে। দ্রুত, উন্মত্ত, অধীর। হিসাব-নিকাশ পিছনে থাক্, সুবিধা-অসুবিধা জটিল সমস্যা প'ড়ে থাক্ লোকালয়ের পথে,—আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—অরণ্য! দেখতে দেখতে শহর ছাড়িয়ে গেলাম। সম্মুখে কেমন একটা অদ্ভুত ধূসর সন্ধ্যা—মৃত জানোয়ারের চোখের মতো অস্পষ্ট শস্যক্ষেত্র। সমস্ত পথটা প্রাণীহীন শ্মশানের মতো, মাঝে মাঝে বাতাসের বিষণ্ণ নিশ্বাস, মাঝে মাঝে ধূলিজালে পথ আচ্ছন্ন হচ্ছে। আমাদের মুখে আর কথা নেই। কিছুদূরে এসে সরকারী সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখা গেল। ডানদিকে রজৌলীর পথ, বাঁ-দিকে একতারার পথ। আমরা বাঁ-দিকের পথ ধরলাম।

আবার সেই কাহুডাগের পথের অনুভূতি! সেই ভয়জড়ান উত্তেজনা, সেই প্রাণের কৌতূহল চোখে মুখে উচ্ছ্বসিত। এদিকে হিংস্র জানোয়ারের উৎপাতে মানুষের বসতি বড় কম। যদি বা থাকে সন্ধ্যার সমাগমে আর

কারো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ধীরে ধীরে চারিদিক কালো হয়ে আসছে। নিগূঢ় নৈঃশব্দের ভিতর দিয়ে কীটপতঙ্গের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমাদের কথালাপ বন্ধ। কেন বন্ধ তা আমরা বোধহয় জানি। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে প্রথম যখন হরিদ্বারে যাই, তখন এমনি এক সন্ধ্যায় সত্যনারায়ণ চটি থেকে দেখেছিলাম প্রথম নীলকণ্ঠ পর্বতের দৃশ্য—হিমালয়ের সেই বিরাট মহিমান্বিত রূপ দেখে স্তম্ভিত প্রাণ হয়েছিল বিস্ময়ে নির্বাক। যেদিন গভীর রাত্রে দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরম্ মন্দিরের পাদমূলে ব'সে ভারতসাগরের উত্তাল তরঙ্গময় মূর্তি দর্শন করেছিলাম •সেদিনও মুখে কথা ফোটেনি! আজ আবার এই দুর্গম অরণ্যের ভয়ভীষণ মহিমার নীচে এসে দেখলাম, মুখে কোনে ভাষা নেই!

—বনবাসী রাজপুত্র রামচন্দ্র চলেছেন সীতার উদ্ধারে। রাবণকে নিধন করবেন সবংশে। অনুজ লক্ষ্মণ, সুহৃদ সুগ্রীব, সেনাপতি অঙ্গদ,—আগে আগে লক্ষ লক্ষ বানর সেনা। সুদীর্ঘ যোজনব্যাপী বিরাট শোভাযাত্রা। সশস্ত্র রামচন্দ্র চলেছেন সকলের পিছনে পিছনে। স্বর্গে দেবগণ শঙ্কাকুল। সসাগরা ধরিত্রী বুঝি রসাতলে যায়। প্রলয় বুঝি আসন্ন। কিবা দিন, কিবা রাত, কিবা শীত, কিবা গ্রীষ্ম—সেই বিশাল-বিস্তৃত শোভাযাত্রা চলেছে অবিশ্রান্ত দক্ষিণ ভাগে।

অকস্মাৎ গতিরোধ হোলো। বানর সেনার শোভাযাত্রা আর একপদও অগ্রসর হয় না। চারিদিকে বিপর্যয় ও বিভ্রাট। তবে কি কোনো দেবতার মায়া! কোনো দানবীর-শক্তির শক্রতা? রামচন্দ্র বললেন, সেনাপতি. এর হেতু কি?

অঙ্গদ বললেন, প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ।

যাও তুমি, সংবাদ আনো।

অঙ্গদ নতশিরে প্রস্থান করলেন। কিন্তু সেই গেলেন, আর এলেন না। দিনের পর দিন কাটলো। এরপর সুগ্রীবের পালা। রামচন্দ্রের আদেশে সুগ্রীবও গেলেন, কিন্তু তিনিও আর ফিরলেন না। তবে কি সীতা উদ্ধার অসম্ভব? তবে কি বিশ্বের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাতে হবে? লক্ষ্মণ, এবার মি যাও, দেখে এসো কোন্ সে মায়াদানব, কোন্ সে দেবতা? সর্ববাধা-বিনাশী অস্ত্রে সংহার করবো বিশ্বকে, আগে তুমি সংবাদ আনো।

লক্ষ্মণ গেলেন, কিন্তু তিনিও আর ফিরলেন না। কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষে ফিরে এলো। হা হতোস্মি! তখন রামচন্দ্র সশরীরে যাত্রা করলেন। লক্ষ লক্ষ বানর সেনার পাশ কাটিয়ে, বন-প্রান্তর অতিক্রম ক'রে, নানা রাজ্য ও অরণ্য উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চললেন। চলতে চলতে এলেন তাঁর সেনাদলের প্রান্তভাগে। কই, কোথাও ত নেই বাধা, কোথাও ত নেই বিশৃঙ্খলা! চিন্তিত হৃদয়ে অকস্মাৎ স্থলভাগের দক্ষিণ সীমানার দিকে তাঁর নীলোৎপল সদৃশ চক্ষু প্রসারিত হোলো। হায়, তবে কি ওই অন্তহীন নীলাভ মহিমার দিকে চেয়ে সবাই আজ স্তম্ভিত? অনন্ত সৌন্দর্য কি সত্যই মানুষকে নিশ্চল করে? ওই বিপুল বিশাল তরঙ্গ-ভঙ্গের নিকট মানুষের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ কি কি এই অলীক?

মহাকবি বাল্মিকী পরিচ্ছেদের শেষে কেবল একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, —সমুদ্র!

আমাদের গাড়ী চলেছে ধীরে ধীরে এঁকে বেঁকে! মাঝে মাঝে শীর্ণ জলপ্রবাহ আকাশের তারকার আলোয় প্রেতিনীর চক্ষুর মতো জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠছে। দিবসের উত্তপ্ত বাতাসে অরণ্যের আবহাওয়া স্নিগ্ধ ও শীতল হয়ে এসেছে। উঁচু নীচু পথ; গাড়ী হেলছে, দুলছে, টাল সামলাচ্ছে। দূরে শস্যক্ষেত্রের কোনো কোনো অদৃশ্য প্রহরী এক একবার কণ্ঠের আওয়াজ দিচ্ছে। বন্য শূকর ও অন্যান্য জানোয়ারের উপদ্রব থেকে শস্য বাঁচাবার এই নাকি রীতি। অদ্ভুত তার কণ্ঠ, যেন কোন্ এক আর্ত হরিণীর কণ্ঠের উপর ব্যাঘ্র তার হিংস্র দাঁত বসিয়েছে! বায়ু-তরঙ্গে ভাসমান তার শীর্ণ তীব্র কণ্ঠে কেবলমাত্র মৃত্যুকেই অনুভব করা যায়। দূর অরণ্যের সীমানায় একটা আলো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে; আলেয়ার আলো হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

পথের চিহ্নই আমাদের পথ নির্দেশ করছে। আমাদের গাড়ী চলেছে মন্থর গতিতে। আলোর রেখাটা ক্রমশ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হচ্ছে। মানুষের সমাগম নেই, গ্রামের চিহ্ন নেই,—তবু আন্দাজে বুঝলেন, আমরা একতারায়

এসে পৌঁচেছি। আরো কিছুদূর এসে দেখলাম, আলোটা আলেয়া নয়, এটা মানুষেরই জ্বালানো।

কিছুদূর এসে ডাকবাংলার কাছে গাড়ী দাঁড়ালো। এখানে আর আলো নেই, চতুর্দিক অন্ধকার। যে-কোনো দিক থেকে যে-কোনো মুহূর্তে জানোয়ার বেরিয়ে পড়তে পারে, সেইজন্যই আলো রাখা হয়নি। কাছাকাছি আশেপাশে কয়েকটা জোনাকি দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে,—সেগুলিও যেন ক্রোধান্ধ হিংস্র জানোয়ারের রক্তপিপাসু দৃষ্টি। চারিদিকের অরণ্য অসাড়, প্রাণ-স্পন্দনহীন। পত্রপল্লবের ভিতর দিয়ে বায়ুর মর্মর কেবল শোনা যায়।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই হঠাৎ মনে হোলো, ওগুলি জোনাকী পোকাও নয়, হিংস্র জানোয়ারও নয়, ওরা অন্য কিছু। কী ওরা? কে ওরা?—সেই অন্ধকারে অকস্মাৎ আবিষ্কার করলাম বিশালকায় প্রেতের মতো কয়েকজন মানুষ নিঃশব্দ প্রহরায় দণ্ডায়মান। জোনাকি নয়, তাঁদের মুখের সিগারেটের আগুন!

আমি টর্চ টিপলাম। সেই আলোয় দেখলাম, পাঁচ সাত জন কালো পোশাকপরা দীর্ঘদেহ বলশালী গুম্ফশ্মশ্রুযুক্ত মানুষ, —কেউ মুসলমান, কেউ পাঞ্জাবী শিখ। সন্দেহ নেই তারা পুলিস সাহেবের বডিগার্ড,—ইতিমধ্যেই আমাদের গাড়ী ঘিরে তারা পর্যবেক্ষণ করছে। মনে মনে হাসলাম। ওরা বাঘ নয়, ওরা পুলিস!

নিকটেই ডাক বাংলা; শিকারিগণের রাত্রির বাসা। এক-পাশে দু-তিনখানা কালো মোটর পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা গাড়ী ঘুরিয়ে নিলাম। এই স্থির হোলো যে, যদি পুলিস সাহেবের দলের হাতে বাঘ মারা পড়ে তবে তিনি রাত বারোটার মধ্যেই ফিরবেন, আমরা তার পরে জঙ্গলে ঢুকবো। অর্থাৎ আমাদের বিশেষ কোনো ভরসা নেই। নবী আক্তার তার গ্রামে গেছে, এখনো ফেরেনি। ফিরবার পথে অরণ্যের ভিতরে কয়েকটা গুলীর আওয়াজ হলো।

কিছুদূর এসে পূর্বদিকের মাঠের উপর টর্চের আলো দেখলাম। পাছে আমরা গুলী ছুড়ি এজন্য কে গলার আওয়াজ দিল। আমরা টর্চের আলোর সঙ্কেত জানালাম। দাদু বললেন, তেওয়ারি, গাড়ী থামাও।

কাছাকাছি আসতেই নবী আক্তারকে টর্চের আলোতে চেনা গেল। ছোট একটি মানুষ, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, ফর্সা রং, মাথায় টুপি, পরনে পায়জামা। এই ছোট মানুষটিকে নৈলে শিকারিদের চলে না। জঙ্গলের পথগুলি তার করতলগত, অন্ধকারে স্পট-লাইট ফেলতে সে ওস্তাদ, নিজে বেশ ভালো শিকারী,—এই মানুষটির ভিতরে অসীম সাহস ও বুদ্ধি। বাইরে সে অতি শান্ত, সলজ্জ, বন্ধুবৎসল, ভদ্র ; কিন্তু অরণ্যের ভিতর এসে দাঁড়ালে তার মতো হিংস্র আর কেউ নয়, তার সকল ইন্দ্রিয় সতর্ক ও সজাগ হয়ে ওঠে, তাকে আর চেনা যায় না।

ঘোষাল ও দাদুকে সে সাদর সম্ভাষণ জানালো। তারপর কানে একটা রবারের নল লাগিয়ে সে আলাপ করতে লাগলো। লোকটা পাথরের মতো বধির ব'লেই বোধহয় তার ভয় কম! জানোয়ারের গর্জন তার কানে প্রবেশ করে না সেইজন্য তার এত সাহস। কথাটা মিথ্যে নয়, বাঘের গর্জনটাই সাধারণত শিকারীর ভয় বাড়িয়ে দেয়। গর্জন শুনলেই শিকারীর হাত কাঁপে, হাতে থেকে বন্দুক খ'সে পড়ে, অনেকে আতঙ্কে জ্ঞানহারা হয়। তবু যারা সাহস ক'রে বন্দুক ছোড়ে, প্রায়ই তাদের হাত-পা স্থির হয় না, গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এইজন্য লোকে বলে, বাঘ শিকারই শ্রেষ্ঠ শিকার।

শেষ পর্যন্ত এই স্থির হোলো, আমরা নিকটেই এক গ্রামে সংবাদের জন্য অপেক্ষা করব রাত্রি একটা পর্যন্ত। পুলিস সাহেব না গেলে আমাদের শিকারের সম্ভাবনা নাই। তথাস্তু। নবী আক্তার আমাদের এই হয়রানির জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ ক'রে শেষে বললে, এ যাত্রায় হোলো না, কিন্তু শীঘ্রই পাটনায় আপনাদের খবর পাঠাবে, আমি নিজে আপনাদের শিকার খেলিয়ে দেবো। এই ব'লে সে বিদায় নিল।

মাঠের পার ঘেঁষে খানা ডোবার উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে আমরা এক জনবিরল বস্তির ধারে এলাম। গ্রামটির নাম আকবরপুর। কয়েকজন দেহাতি ছাড়া আর কোনো জাতের মানুষ নেই—কিন্তু তারাও এত রাত্রে সব নিশুতি, কোনো সাড়াশব্দ নেই। খুঁজে খুঁজে আমরা এক কুটীরের ধারে এলাম। রাত গভীর—ঘন অন্ধকারে অদূরে অরণ্যভূমি থম থম

করছে। পূর্বাকাশে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মৃদু আভাস আছে, কিন্তু সেই মৃত্যুম্লান আলোয় অরণ্যদেশ যেন আরো ভয়ভীষণ হয়ে এসেছে।

আমরা সবাই সাহেব। সঙ্গে বন্দুক, রাইফেল্, অন্যান্য অস্ত্র। মোটর আছে, চাপরাশী আছে, তেওয়ারি আছে। সাহিত্যরসিক সুবক্তা ঘোষাল, কৃষ্ণভক্ত দাদু—কলেজের ছাত্র নব্যযুবক কমলকুমার এবং আমি—প্রবৃত্তি চালিত পরিব্রাজক—আমরা সবাই সাহেব। জনদুই কৃষ্ণকায় দেহাতি আমাদের দেখে ভয়ে ভয়ে তাদের 'গর্তে' ঢুকলো।

খান দুই দড়ির খাটিয়া ও একখানা তক্তা পাওয়া গেল। সবই শ্যামলালের সংগ্রহ, প্রভুর সেবা ও যত্নে তার ত্রুটি নেই। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে চা প্রস্তুত ক'রে দিয়ে সে রাত্রির ভোজন প্রস্তুতের কাজে লেগে গেল। সেই রাত্রে পর্ণকুটীরের ভিতরে সুস্বাদু পোলাও ও তরকারী চিরস্মরণীয়। কমল মহানন্দে তার ক্ষতিপূরণ ক'রে নিল।

কুটীর প্রাঙ্গণে আলো নেই—বাইরে খাটিয়ার উপর ব'সে অন্ধকারে আমাদের গল্পগুজব চলতে লাগল। প্রধান বক্তা ঘোষাল। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটি সরস। সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, এজন্য 'হাই সোসায়টিতে' তাঁর আনা-গোনা—সেই সমাজেরই গল্প। মাঝখানে ব'সে আমি গল্প শুনছিলাম এবং শুনছিলাম না। না শোনার কারণ এই যে, ভ্রাম্যমান অবস্থায় পরিচিত প্রাত্যহিক জীবনের 'রুটিন্' পিছনেই ফেলে আসতে হয়, সঙ্গে আনতে নেই। আমি ডাক্তার, আমি সেক্রেটারী, আমি ছাত্র, আমি সাহিত্যিক—সেই সব পরিচয়ের প্রেত যদি আমাদের পিছু নেয় তবে আর আমাদের মুক্তি নেই। নিজের ব্যবহারিক চেহারাটাকে ভুলতে পারাই ভ্রমণের সার্থকতা ; সেইজন্য বাঁধাধরা নিয়মে, অফিসে ছুটি নিয়ে, রিটার্ণ টিকিট কেটে, পাঁচখানা চিঠিপত্রে আটঘাট সামলে—আর যাই হোক ভ্রমণ হয় না। আউটিং মানে ভ্রমণ নয়।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত গন্ধে আমি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। যেন ওই অরণ্যে শত শত জানোয়ারের গাত্রগন্ধে মিশানো এক ঝলক বায়ুর নিশ্বাস আমার প্রাণের মূল পর্যন্ত নাড়া দিয়ে গেল। আমি যেন নিজের অস্তিত্বের

চেতনা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেললাম। কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আছি, কোথায় বা যাবো—কোনো কিছুই আর মনে রইলো না। তন্দ্রা যেন আমার দুই চক্ষুকে আবিল ক'রে তুললো। উপরে অনন্ত আকাশে জ্যোতির্ময় তারকার দল, তার নীচে কোটি কোটি শাখা-প্রশাখায় লতা-পাতায় পত্র-পল্লবে নিস্তব্ধ গহন অরণ্যানি—যেন অযুত শিকড়ের কঠিন নিগড়ে, অসংখ্য বাহুর ঘন আলিঙ্গনে অন্ধকারকে বন্দী ক'রে রেখেছে। আমি যেন কান পেতে শুনলাম, অরণ্যের জঠর থেকে মুক্তি পাবার জন্য অন্ধকার চারিদিকে বিদীর্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করছে। ওখানে যেন দিন-রাত্রি শীত-গ্রীষ্ম কিছু নেই—অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল পর্যন্ত যেন কঠিন, নিরেট, শীতল ভয়ঙ্কর এক ঋতু তার দুই কালো ডানায় অরণ্যকে আবৃত ক'রে প'ড়ে রয়েছে।

স্বপ্ন নয়, মতিভ্রম নয়, কখন যে নিঃশব্দে উঠে অন্ধকার হাতড়ে প্রাঙ্গণ পার হয়ে একদিকে চলেছি সেকথা নিজেরই মনে নেই। জানি না কে আমার ভিতর থেকে পথনির্দেশ করছে, কে আমাকে সম্মুখের অন্ধকারের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে আহ্বান করছে। শুধু জানি চারিদিকে যেন একটা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট মায়াময় ইশারা আমাকে কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। তারা যেন আমাকে চেনে, আমার প্রাণতত্ত্ব জানে, আমার আত্মার ভাষা বোঝে—আমাকে তাদের বড় প্রয়োজন। অসংখ্য বৃক্ষ-শাখার অগণ্য অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে তারা যেন অদ্ভুত ইশারায় আমাকে অল্প অল্প আকর্ষণ করছে! সেই প্রাচীন শিকড়ের জটা, সেই অদৃশ্য জটিল বৃক্ষলতা, সেই প্রেতবাহুর মতো ভয়াল শাখা-প্রশাখা আমাকে যেন অচ্ছেদ্য আকর্ষণে গ্রাস করতে উদ্যত। সেই অন্ধকারের অন্তরের নিগূঢ় গন্ধের মায়া আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রবেশ ক'রে অস্বাভাবিক নিদ্রায় আমাকে অচেতন ক'রে তুলতে লাগলো। আমি আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গেলাম।

জীবনতত্ত্বের এই কি সকলের বড় ব্যাখ্যা, সর্বপ্রধান সমস্যা? এই আকর্ষণ আর বিকর্ষণ—এই কি কঠিনতম প্রশ্ন? সকলের মাঝখান থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনে জীবনের আদিম রহস্যের গর্ভে কে এমন ক'রে নিক্ষেপ ক'রে দিল? পিছনে আমার প্রাত্যহিক দুঃখ সুখের ওলোটপালটের ইতিহাস, সহস্র স্নেহ মমতার বন্ধন, সম্ভোগ ও বৈষয়িকতার বস্তুপুঞ্জ, আমার পরমায়ুর

পিয়ালায় পার্থিব আনন্দ বেদনার রঙীন মদিরা,—কিন্তু তবু আমার স্নায়ু-তন্ত্রের, শিরা-উপশিরায় বুকের রক্ততরঙ্গে ওই অরণ্যের প্রাচীন তৃষ্ণার্ত আত্মা এমন অস্থির নৃত্যে আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে কেন? তবে কি ওই মহাবনানীর পশ্চাতে জটাজুটধারী কালপুরুষ ব'সে আছেন আমারই প্রতীক্ষায়? আমি চক্ষু বন্ধ করলাম।

ভিতর ও বাহির একাকার—তরঙ্গে তরঙ্গে অন্ধকার তার প্লাবনোচ্ছ্বাসে আমাকে কোথায় নিয়ে গেল। আমি যেন অতীত ইতিহাসের সূত্র ধ'রে অযুত শতাব্দী উত্তীর্ণ হয়ে গেলাম। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র কোথাও কিছু নেই, আলো নেই; স্মৃতি ও বিস্মৃতির আলোছায়ার গোধূলি লগ্নে চেয়ে দেখলাম এক অনন্ত বিবর্ণ মহাব্যোমে আমি লুপ্ত। অনুপরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র, দেহহীন আমি এক প্রাণবীজ যেন সেই আদি অন্তহীন শূন্য-সমুদ্রের অতল গহ্বরে বিচরণ ক'রে ফিরছি। অকস্মাৎ দেখি এক অলৌকিক আলোকোজ্জ্বল রাজ্য! চারিদিকে হোম-কুণ্ডের আগুন, সেই অগ্নি আভাসে অনুভব করলাম দেহহীন প্রেত ও প্রেতিনীর নিঃশব্দ নৃত্য—তাদের মধ্যস্থলে বিশাল মহাকাল মূর্তি ধ্যানাসীন। মগ্নচৈতন্যের এক অদ্ভুত আলোড়নে আমার তন্দ্রালু দৃষ্টি বিস্ফারিত করলাম। সেই কালপুরুষের বিরাট দেহ যেন মর্ত্যভূমি থেকে আকাশ স্পর্শ ক'রে! চেয়ে দেখলাম, তাঁর শীর্ষদেশে বিলম্বিত চিরতুষারময় শ্বেতজটাজুট, নিমীলিত দুটি আয়ত শিবনেত্র; প্রসারিত দুই হস্তের দুইদিকে ও পদপ্রান্তে অকূল নীল সমুদ্র—আর দেখলাম, তাঁর সর্বাঙ্গভরা অরণ্য, সেই মহারণ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কোটি কোটি কীট-পতঙ্গ, পশু, মানুষ, ব্যাঘ্র, পক্ষী, লোকালয়, সংগ্রাম, সভ্যতা,—লক্ষ লক্ষ গ্রহ উপগ্রহ, তাঁর নিশ্বাস প্রশ্বাসে অবিরাম সৃষ্টি ও প্রলয়লীলা!

একটা নাড়া পেয়ে চমক ভাঙলো। দেখি ঘোষাল ও দাদুর মাঝখানে আমি ঠিক তেমনি ব'সে আছি, তাঁরা দুজনে দুটি খাটিয়ায় শয়ান। একখানা কম্বল আমার গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে ঘোষাল বললেন, রাত একটা লাগাৎ পালাতে হবে, একটা ঘুম দিয়ে দেবেন নাকি?

চমৎকার প্রস্তাব।—এই ব'লে কম্বল ঢাকা দিয়ে সেইখানে শুয়ে পড়লাম। অরণ্যের আবহে শীতার্ত শরীর যেন অবশ, আড়ষ্ট।

নিদ্রা নয়, তন্দ্রা। নিদ্রা ও জাগরণের একটা আবিল সংমিশ্রণ। বিচিত্র স্বপ্ন যেন দুই চক্ষের ভিতরে ও বাহিরে চলাফেরা করছে, তার কোন মাথামুণ্ড নেই। চারিদিকে যেন ছায়াচারীর দল নানা দুর্বোধ্য ইশারায় ডাক দিয়ে কোথায় কোন্‌দিকে মিলিয়ে যায়। কিছু বুঝতে পারিনে, কিছু বোঝাতে পারিনে। কিন্তু তবু রাত্রিটি বড় সুন্দর! আকাশের চন্দ্রাভাস, উজ্জ্বল তারকাদলের অনিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টি, স্নিগ্ধ বায়ুমর্মর, অজানা কোন্ পাখীর দূরাগত কণ্ঠ, একটি মাত্র রাত্রির এই অসাধারণ জীবনযাত্রা, এই চির অজানা ক্ষুদ্র কৃষকের কুটীর,—সমস্তটা মিলে আবার যেন ধীরে ধীরে আমাকে মোহাচ্ছন্ন করতে লাগল।

ক্ষণিক স্বাচ্ছন্দ্য সুখ, অস্তিত্বের গভীর তীব্র অগ্নিময় মুহূর্তগুলিই কি আমাদের পরমায়ুর সত্য পরিচয় নয়? ভাবছিলাম আর্টিষ্টের জীবনের কথা। একই উৎস থেকে সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য,—একই ব্রহ্মার চতুর্মুখ। এত বড় যার শক্তি সামাজিক জীবনে তার ব্যক্তিত্ব নেই। লৌকিক বিচারে তারা অকর্মণ্য, ভীরু, শক্তিহীন। তাদের নেই বিষয়বুদ্ধি, তারা করে না উপার্জন, তারা যোগায় না পরকে অন্ন আর আশ্রয়,—সমাজে তারা যেন পরাশ্রিত জীব। প্রচলনকে তারা ভাঙে, নীতি আদর্শকে তারা বিদ্রূপ করে, মানুষের বহুদিনের সযত্ন সৃষ্টির প্রতি তাদের নির্দয় অবহেলা। মেয়েদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটে না তার দ্বারায়, মেয়েরা তার কাছে পায় না বিপদে আশ্রয়, প্রণয়িনী করে নিদারুণ অবজ্ঞা—অথচ এর প্রতিকার নেই। আর্টের সেবা করাই তার ধর্ম আর যা কিছু—সংসার, উপার্জন, বিষয়চিন্তা, সন্তান-পালন, সঞ্চয়লোভ,—সমস্তই তার পক্ষে পরধর্ম। শিল্পীকে কটূক্তি করবার অধিকার সামাজিক জীবের নেই—অধিকার তাদের কাছে যারা আর্টের তত্ত্ব জানে। আর্টিষ্টকে যে ভালোবাসবে, আর্টিষ্টের পিছনে ছুটে যারা আনন্দ পাবে তাদের নিঃস্বার্থ আনন্দবোধ থাকা দরকার; কোনো সামাজিকতা, কোনো দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধের নিগড়ে তাদের বাঁধলে চলবে না। অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যগতিই শিল্পী-জীবনের আনন্দ। রসের প্রয়োজনে তারা লোকালয়ে ছুটবে, প্রেমের প্রয়োজনে তারা নারীর আশ্রয়ে জুটবে।

এমনি নানা এলোমেলো কথা ভাবছিলাম। অকস্মাৎ আবার একটা

বিস্ময়কর অনুভূতি বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো আমার সর্ব-শরীরে সঞ্চারিত হয়ে গেল। অর্ধ-জাগ্রত তন্দ্রার ভিতরে কেমন একটা অসহ্য অনুভূতি। কিছুক্ষণ আগেকার সেই সর্বনাশা মদিরগন্ধ আমার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে অবশ ক'রে আন্‌লো। অতি উত্তেজক মাদক দ্রব্যে যেমন দেহের ভিতরের অস্থিসন্ধিতে একটা নিদারুণ যন্ত্রণা হয়—এও তেমনি। মনে হলো আমার সর্বশরীরের উপর লোমশ কোনো বিশালকায় জানোয়ারের পাষাণ-ভার, সে যেন টুঁটি টিপে মারতে চায়। আজ রাত্রে এ আমার কী পরিবর্তন ? কেন নিবিড় ক'রে ঘুম আসে না কেনই বা সুস্পষ্টরূপে সজাগ হয়ে উঠে বসতে পারি না ? শক্তি কোথায় গেল ? কোথায় গেল ব্যক্তিত্ব ? সেই গুরুভার পাষাণ যেন তার ভীষণ চাপে আমাকে সম্মোহিত করেছে, শক্তিহীন করেছে। আমার পালাবার পথ নেই, চীৎকারের কণ্ঠ নেই।

উপরে এই লোমশ জানোয়ারের শত সহস্র পাকের আলিঙ্গন, প্রাণ-সংহারকারী বন্ধন, এই নিশ্বাসরোধ-করা পীড়ন—কিন্তু ভিতর দিকে চেয়ে দেখলাম, দেহের সকল গ্রন্থি যেন শিথিল হয়ে এসেছে। শিরা, স্নায়ু, অন্ত্রতন্ত্র, —আমার দেহাভ্যন্তরের কোটি কোটি উপশিরার জটিল জাল, আমার সর্বাঙ্গের অযুত রন্ধ্রে, অগণন ছিদ্রপথে রক্ত চলাচলের যে রহস্যময় গতি— আজ এই আবিল তন্দ্রার মধ্যে সেই বিচিত্র দেহের তত্ত্ব মনশ্চক্ষে যেন উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। সেখানেও যেন শত সহস্র জটাগ্রন্থি, উপশিরাদলের লক্ষ লক্ষ শাখা-প্রশাখা, মেরুদণ্ডের অতি প্রাচীন এক বিশাল বৃক্ষ ; সেখানেও সহস্র সহস্র প্রাণী নানা বিভক্ত দলে প্রতি মুহূর্তে পরস্পরকে সংহার ক'রে চলেছে। তবে কি মানুষের দেহের ভিতরটাও এক বিশাল বিপুল অরণ্য ? সে-অরণ্যও কি প্রতি ঋতুতে সঞ্জীবিত হয় আমাদের প্রাণাগ্নিতেজে ? আমার চক্ষু যেন আলোকিত হয়ে এলো।

দিব্যদৃষ্টিতে দেখলাম, এই দেহারণ্যের ভিতরে যিনি আমার প্রাণদেবতা তিনি ধ্যানমগ্ন, তাঁর আসনের চারিদিকে প্রবৃত্তির হিংস্র জানোয়ারগুলি বিচরণ ক'রে ফিরছে ; দেবতার সম্মোহনী তপস্যায় তারা যেন প্রশান্ত হৃদয়,—তাদের লোভ নেই, ক্ষুধা নেই। লক্ষ লক্ষ কীট-পতঙ্গ, পক্ষী, সর্প,—নামহীন পরিচয়হীন কোটি কোটি প্রাণী সেই পরম পুরুষের প্রাণ-

স্পর্শে জ্বলন্ত ও জীবন্ত। লতায়, পাতায়, শাখায়, জটায়, শিরায় উপশিরায়, সন্ধিতে, গ্রন্থিতে, কোটরে, জঠরে, গহ্বরে,—সেই প্রাণাগ্নি নিত্য সঞ্চরমান! তবে কি এই পরমা বিশ্বপ্রকৃতির সৃজন-সঙ্গমে পরম পুরুষের সৃজনাগ্নি নিত্য সঞ্চালিত হয়ে চলেছে? তবে কি কামাগ্নিক্ষুধাই সৃষ্টির আদিমতম অভিব্যক্তি? তবে কি মানুষের সঙ্গে পশুর, পশুর সঙ্গে পাখীর, পাখীর সঙ্গে পতঙ্গের, পতঙ্গের সঙ্গে কীটাণুকাটের গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক,—একই অগ্নিরসের অবিচ্ছেদ্য কুটুম্বিতা?

সেই লোমশ জানোয়ারের কঠিন নিষ্পেষণের নীচে আমার উৎপীড়িত প্রাণ কেবল এই প্রশ্নটাই করতে লাগল, কেন তোমার এই অরণ্য ভ্রমণ? কেন এই প্রাণসংহার বিলাস?

উত্তর দিলম, কে মারে? কে মরে? আমার হাতে কি সৃজন ও ধ্বংসের ভার?

দুষ্প্রবৃত্তি তোমার, পাপের অংশ তোমার।

ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন—

আবার সেই কঠিন পীড়ন। যন্ত্রণায় রুদ্ধকণ্ঠ আমি—আমি কি আজ সত্যই হিংসায় লিপ্ত, হত্যা করা কি সত্যই পাপ? কোথায় পাপ, কোথায় পুণ্য? পৃথিবী কি এক বিরাট হত্যাশালা নয়? বৃক্ষমূলের প্রাণশক্তি একদিন শুকিয়ে যায়, ফুলের মৃত্যু ঘটে প্রতিদিন, পাতা লতা ঝরে' যায় দুরন্ত বসন্তের তাড়নায়, পশুর হাতে পশু মরে, মানুষের হাতে মরে মানুষ। জলের নীচে মরছে অসংখ্য প্রাণী প্রতি পলকে, অন্তরীক্ষে কোটি জীবাণু ধ্বংস হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে,—যে গ্রহ-লোকের কথা আমরা আজো জানিনে, আজো যার সন্ধান পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়নি,—সেখানেও ধ্বংস ও সৃষ্টির ওলোট-পালট চলেছে অবিশ্রান্ত। কা'কে আমি হত্যা করি, কা'র হাতে আমি হত হই? কেন এই মায়া, কেন বা এই ভ্রান্তি? পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দ আনন্দ-বেদনা,—এর সংজ্ঞা ত আমাদের কোন্ সঙ্কীর্ণ চেতনার মধ্যে আবদ্ধ। মৃত্যু আছে, হিংসা আছে, সংহার আছে,—তাই ত পৃথিবী এত সুন্দর! অবিরাম ধ্বংস ও হত্যার ভিতর দিয়ে অরণ্যক্ষেত্র বারে বারে নব নব সজ্জায় রূপান্তরিত হয়, তাই ত তার এমন অপরূপ প্রাণোচ্ছলতা!

সৃষ্টি আছে, অথচ ধ্বংস নেই, 'পাপ' নেই—তবে ত স্তূপীকৃত বস্তুপুঞ্জে পৃথিবীর কণ্ঠরোধ হবে, প্রলয় ঘটবে !

ধ্বংসের কাজে আজ আমাকে এনেছে সেই শক্তি প্রকৃতির সেই অবশ্য-গ্রাহ্য নিয়ম,—যে-নিয়ম আমাকে সৃজন করেছে। সেই প্রলয়ঙ্করের আমি প্রতীক্, সেই মহাসাধকের আমি প্রতিনিধি, যার অত্যাশ্চর্য তেজ আমার ভিতরে ক্রিয়া করেছে, আমার প্রাণকে সঞ্জীবিত করছে, শক্তি সঞ্চারিত করছে। জানোয়ার সংহার আমার পেশা নয়, পাপ করা আমার প্রকৃতি নয়, প্রবৃত্তির প্রশ্রয়ে ছুটে বেড়ানো আমার নেশা নয়,—জীবনের মূলে সেই আদিম নটরাজের হাতে আমি একটি সামান্য ক্রীড়নক ; আমার ভিতরে লোভ, হিংসা, ভয় অহমিকা সেই আদি শক্তির খেলা ; সেই পুরুষের ইচ্ছায় আমার ভিতরে বীর্য, তেজ, প্রেম, বৈরাগ্য আনন্দ নিত্য সঞ্চারিত ; আমার জীবন সেই আদি-অন্তহীন আত্মার তপস্যার আসন !

মনে মনে বলমাম, হে অরণ্যের আত্মা, আমার স্বভাবের মধ্যে তুমি আমাকে প্রতিফলিত করেছ এজন্য তোমাকে প্রণাম করি। হে মহাযোগী, সমস্যা ও দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দাও, সংশয় ও ভয় দাও ঘুচিয়ে,—হিংস্র শ্বাপদের ভয়ভীষণ দংষ্ট্রায়, অজগর সর্পের বিষাক্ত রসনায়, গুল্মলতার প্রাণরহস্যে, জটামূলের নিগূঢ় রসলোকে, অরণ্য পুষ্পের অপরূপ গন্ধে, পাখীর কণ্ঠে, ভ্রমরের অভিসারে যেন তোমার প্রসন্ন রূপকে আমি অনুভব করতে পারি ! হে সর্বাধার, তোমাকে প্রণাম !

হে প্রাচীন, তোমার সঙ্গে আমার অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা। তুমি জরাজীর্ণ নও, বার্ধক্য তোমাকে স্পর্শ করে না, তাই তুমি চিরনূতন, চিরবিস্ময়কর। তোমার মহিমায়, সহজ মহিমায়, তোমার সহজ স্বচ্ছ প্রাণধারায় নব নব চেতনা প্রবাহিত, তোমার চিরজাগ্রত প্রাণশক্তি নিত্য নূতন সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে অবিশ্রান্ত প্রকাশ করে চলেছে। তোমার খর্বতা নেই, ক্ষুণ্ণতা নেই, পুরাতন সংস্কারের বস্তু-স্তূপে তুমি ভারাকান্ত নও, তুমি চির উদার। হে প্রাচীন বনস্পতি, তোমার প্রশান্ত ছায়ায় নূতনকে আশ্রয় দাও, তোমার নিরাপদ জঠরের মধ্যে নবীনকে গ্রহণ করো।

কোলাহল কলরবে তন্দ্রা ছুটে গেল! ঘোষাল আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, উঠুন, উঠুন, রাত দেড়টা বেজে গেল। এর পরে আবার রজৌলি জঙ্গলে যেতে হবে। আপনি বড় ঘুম-কাতুরে—এই বলে তিনি আমার গায়ের উপর থেকে সেই ভারী লোমবহুল কম্বলখানা টেনে নিলেন। কম্বল-খানা জাদু জানে।

উঠে বসলাম। তারকার উজ্জ্বল দীপ্তিতে পরিচ্ছন্ন আকাশে ঝলমল করছে, জ্যোৎস্না অতি মৃদু, বিবর্ণ—রুগ্না সুন্দরীর মুখের মতো। তার নীচে অন্ধকার রাত্রির গর্ভের ভিতরে অরণ্যশিশু যেন প্রভাতের আলোয় ভূমিষ্ঠ হবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে!

কম্বলখানা জড়িয়ে সকলের সঙ্গে আমি গাড়ীতে উঠলাম।

একতারার চেহারাটা রাত্রির অন্ধকারে দেখে চলে গিয়েছিলাম। সেই অন্ধকার বনময় একতারাকে এমন রহস্যাবৃত ক'রে রেখেছিল যে, আমার কৌতূহলের সীমা ছিল না। এমন অরণ্যময় ভূভাগ অনেক দেখেছি, হয়ত নূতন ক'রে জানবার কোনো বস্তুই কোথাও ছিল না, কিন্তু জানা আর অজানার মাঝ-খানে সেদিনকার ঘন নিশায় এমন কোনো সেতু ছিল না যার খোঁজ পেয়ে খুশি হয়ে চলে যাওয়া যায়। তাই বারে বারে অনুভব ক'রে দেখি, একতারার অরণ্য অন্তরে অন্তরে আকর্ষণ করছে। রহস্যময়তা আর অজানার আকর্ষণ এমনি করেই আমাদের এক অরণ্য থেকে অন্য অরণ্যে টেনে নিয়ে যায়। জন্তু-জানোয়ার শিকার করবো, এই উত্তেজনাটাই প্রকাশ্যে সজাগ থাকে, গোপনে থাকে অরণ্য-আত্মাকে জানবার দুর্বার পিপাসা ও অধ্যবসায়!

তাই সেদিন সন্ধ্যায় পুনরায় নওয়াদার পথ দিয়ে পূর্বদিকের প্রান্তর অতিক্রম ক'রে আমরা একতারার ডাকবাংলায় এসে হাজির হলাম। সঙ্গে ঘোষাল নেই,তাঁর পরিবর্তে আছেন সাহিত্যরসোৎসাহী সুধীন্দ্র নিয়োগী,-কাজ এবং অকাজের এমন সংস্কারমুক্ত সঙ্গ সহজে মিলে না। বৌদিদি আছেন, শ্যামলাল আছে, তেওয়ারী আছে।

ডাকবাংলার দক্ষিণের ঘরখানায় আমরা আশ্রয় নিলাম। পাশের ঘরে মিঃ চৌধুরী নামক একজন মুসলমান জমিদার ও তাঁর এক সঙ্গী এসেছেন।

তাঁরা অভিজ্ঞ শিকারী,—আজ গভীর রাত্রে তাঁরা সশস্ত্র হয়ে অরণ্যে প্রবেশ করবেন এই বাসনা। এই-খানে কাছাকাছি তাঁদের অনেক জমিদারী, এখানকার সকল অলিগলি তাঁদের করতলগত। আমরা যে সপরিবারে শিকারে এসেছি, প্রয়োজন হ'লে তাঁদের সঙ্গী হ'তে পারি—এই কথাটার আভাসে তাঁরা পুলকিত হলেন ব'লে মনে হোলো না। বাঘ শিকার তাঁরা অনেক করেছেন, বাঘ ভিন্ন আর কিছু শিকার করার উৎসাহ তাঁদের কম, একথাটাও পরম্পরায় কানে এলো। কিন্তু সমস্যাটা দেখা দিল আমাদের পথ-প্রদর্শক নবী আক্তারকে নিয়ে। তার মতো স্পটার (spotter) এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয় নেই, এমন কি ডাক্তার হবিব পর্যন্ত না। নবী আক্তারের প্রশংসা আগে যা শুনেছি, সেই মাঠের পথে মোটরের আলোয় যেটুকু তাকে দেখেছি,—এখানে এবারে এসে তার সেই প্রশংসা দ্বিগুণ হয়ে কানে এলো। আমাদের আসার আগে থেকেই যে চৌধুরীর সঙ্গে নবী আক্তারের বন্দোবস্ত হয়েছিল একথা আমরা জানতুম না। এখন জানা গেল, চৌধুরীর দাবী আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি। তিনি জমিদার, অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক, কৃতী শিকারী, তিনি এখানে সবাইকে হুকুমের চাকর করে রাখতে পারেন,—সুতরাং নবী আক্তার আজ আমাদের ছেড়ে যে তাঁর দিকে হেলবে এটা খুবই স্বাভাবিক। দাদুর অবস্থাটা দেখতে দেখতে করুণ হয়ে উঠলো। তাঁর শিকার কেমন করেই বা হবে, তাঁর পথপ্রদর্শকই বা কে? দাদুকে অবস্থা-বিপাকে অনেকটা যেন চৌধুরীর অনু গ্রহের দিকে চেয়ে থাকতে হলো। তাঁকে দয়া ক'রে চৌধুরীরা নিজেদের সঙ্গে নেবেন—দাদুর যদি তাতে সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য আমরা দুই বন্ধু নানারূপ বক্তৃতা দিতে লাগলাম।

শীতের রাত মধুর বাতাসে, জ্যোৎস্নায় কবিতায় কোনো দিনই মধুর নয়, গাছপালা থেকে শুরু ক'রে বিশ্বপ্রকৃতি শীতল অন্ধকারে কেমন যেন জমাট ও আড়ষ্ট, তার এই প্রাণহীনতা সহজেই ভয় বস্তুটাকে প্রশ্রয় দেয়। সেইজন্য ঘরের বাইরে যাওয়া আমাদের পক্ষে স্বস্তিকর নয়—আমরা ভিতরেই পেট্রো মাক্স জ্বালিয়ে বৌদিদির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। একথা শুনলে আমরা আর বিস্ময়বোধ করিনে যে, আমাদের জানালার বাইরে কোনো

হিংস্র জানোয়ার চলাফেরা করছে। ভয় বস্তুটার সঙ্গে ইতিমধ্যে এতই অভ্যস্ত হয়েছি যে ওটাতে আর মাদকতা নেই, এখন কেবল আত্মরক্ষা ক'রে চলাটাই বড় কথা। তবু একথাটা অস্বীকার করলে চলবে না যে আমাদের পরিচিত প্রাত্যহিক জীবনটা আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। এখান থেকে সভ্য সমাজ বহুদূরে' যানবাহনাদির চেহারা এ তল্লাটে একরূপ অপরিচিত বললেই হয়, রেল-ষ্টেশনটা ঠিক কোন্‌দিকে এ অনেকেই জানে না,—যে বৈচিত্র্য আর উদ্বেগে আধুনিক সভ্যতা নিত্য সচকিত, এখানে তার আভাস নেই। শীতের এই অন্ধকারে আকাশের তারকার দল ছাড়া যতদূর দৃষ্টি চলে দিগ্‌দিগন্তে মানুষের জ্বালানো একটি প্রদীপও চোখে পড়ে না। উত্তরদিকে অবারিত সীমানাচিহ্নহীন প্রান্তর, পূর্ব ও দক্ষিণভাগ পরিবেষ্টন ক'রে বিশাল অরণ্যময় পর্বতমালা, শত সহস্র শ্বাপদের নিভৃত বিচরণ-ক্ষেত্র। এমন একটা অবস্থায় কল্পনাটা তার স্বাভাবিক পথ ধ'রে চলে না, মন উড়ে চলেছে পারিপার্শ্বিকের বন্ধন ডিঙিয়ে অপরিচয় থেকে অজানার দিকে। কোন্ দিকে যেন সুমেরু শিখর, কোন্ পথে শ্বেতভল্লুক বিচরণ করে তুষারের দেশে, কোথায় আফ্রিকার কোন্ গহন ভূমিতে নরখাদকের বিচিত্র জীবনযাত্রা, হিমাচলের কোন্ রহস্যতলে জটাজুটধারী অতি-মানবের অদ্ভুত গৃহস্থালী,— একটার থেকে আর একটায় উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে কল্পনা। মাঝে মাঝে ফিরে আসছি ব্যক্তিগত জীবনে। বাহিরের অন্ধকারে অজানা কীটপতঙ্গের আওয়াজে সচকিত মন সজাগ হয়ে আবার যোগ দিচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনায়। এমন ক'রে বাজলো রাত দশটা এগারোটা। আমাদের আলাপ আর গল্পের অন্তরার মাঝে মাঝে দাদু এসে যোগদান করছেন। তিনি আনছেন অরণ্যের সংবাদ। তাঁর চঞ্চল আনাগোনায় দেখছি শিকারের অদম্য উৎসাহ, আর তাঁর চোখের তারায় লক্ষ্য করছি দোনলা বন্দুক আর রাইফেলের ছিদ্রগুলো। আজ সমস্ত দিনের মানুষটার পার্থক্য অনেক। তিনি একবার এসে আমার উদ্দেশে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বললেন, হ্যাঁ, তোমার 'শিকারের সন্ধানে'-গুলো নানা কাগজে পড়লাম। কিন্তু—কিন্তু—কি জানো?

সুধীন্দ্র বললেন, কি?

দাদু অস্থির হয়ে বললেন, হয়নি, যা চেয়েছিলাম তা পাইনি।

বললাম, কি চান আপনি ?

দাদু বললেন, ঠিক কি চাই বলা কঠিন। তবে কি জানো,—কবিতা, আছে তোমার লেখায়, আছে বৈষ্ণবতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক রস—না, না, এ চলবে না ; দেশের ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব তোমাদের হাতে—আর তাদের বৈষ্ণবীপনা শিখিয়ো না—ওসব আর চলবে না শক্তিহীন হয়ে চলেছে তারা, তাদের বুকে সাহস নেই, ভয়ঙ্করকে জয় করার অসীম শক্তি তাদের নেই। চলবে না ভাই, ওসব আর চলবে না।

সুধীন্দ্র বললেন, ভয় কুসংস্কার আর দুর্বলতা আমাদের রক্তে, একথা আপনি মানেন ?

মানি বৈ কি—দাদু বললেন, তাই ব'লে সব খুলে দেখিয়ো না। আছে অনেক, অনেক পাপ, অনেক অধঃপতন—এই ব'লে তিনি ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে লাগলেন। দেয়ালের কোণে ছিল রাইফেল আর বন্দুক, সে দুটোকে নিয়ে একবার নাড়াচাড়া ক'রে আবার রেখে দিলেন।

আমরা তিনজনে অন্যদিকে ফিরে আছি কিন্তু কান দুটো আছে দাদুর দিকে। তিনি কি যেন চাঞ্চল্যকর চিন্তায় কেমন একটা অস্বস্তি প্রকাশ করছিলেন, তাঁর প্রাণের মধ্যে অর্থহীন একটা প্রতিবাদ নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে ফেটে ফেটে উঠছিল। এক সময় থেমে তিনি বললেন, অনেক আশা ক'রে তোমার লেখাগুলো পড়ছিলাম, ভাবছিলাম, হয়ত এবার কিছু পাবো—কিন্তু কই, এ যে সেই কান্না, সেই নিত্যানন্দী প্রেম ! হাঁ হে, বাঘের চোখে তুমি দেখলে ভগবানের রূপ ? বাঘভাল্লুকের ঘরে ঢুকে তুমি দেখলে ঋষির তপোবন ? ছি ছি, এ আমাদের জাতীয় চরিত্র। এই শান্তিবাদ আর চলবে না হে, এ ছাড়তে হবে। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা কই, কোথায় কামানে কামানে গলাগলি, মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠবে কবে জনপদ ? সেই লেখা লেখো হে, যে লেখা সন্ধান দেবে অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতার।' সেই ভাষা প্রকাশ করো যে ভাষা শুনলে সূর্যের প্রাণপিণ্ডকে ছিঁড়ে আনতে সাধ যাবে, সেই কথা বলো, যে কথা কানে গেলে সাধ যাবে

যারা অত্যাচারী, যারা শক্তিমত্ত বলদর্পী, তাদের বুকের রক্ত খুলে নিয়ে হোলি উৎসব করার !

সুধীন্দ্র বললেন, সেটা কি সৎসাহিত্য হবে দাদু ?

না, কিন্তু সৎসাহিত্য কিছুকাল বন্ধ থাক্। রোগে, উপবাসে, বীর্যহীনতায়, অশিক্ষায়, দুর্বলতায় যে জাত মরে, তার হাতের ভিক্ষান্ন খেয়ে যে সাহিত্যিকরা ফুল আর চাঁদ আর প্রেম আর শাড়ির আঁচলের প্রশস্তি গেয়ে বেড়ায় তাদের কি বলব ? তারা কোন্ সমাজের জীব ? রবিঠাকুরের পর সৎসাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা কিছুকাল বন্ধ থাকলে আপত্তি কি ? এর পরে যে আর পাঠক জুটবে না ! না, না, ওসব কথা আমাকে বোঝাতে চেয়ো না, ললিত-সাহিত্যরসের দিকে আমার ঝোঁক তোমাদের চেয়ে কম নয়,—কিন্তু দেশকাল-পাত্রের স্বাভাবিকতা দেখবে না কেন ? একদিকে মার খাবে, আর একদিকে বিতরণ করবে প্রেম ? একদিকে অপমানে আর উপবাসে অধঃপাতের দিকে নেমে যাবে আর তারই সঙ্গে গাইবে ঈশ্বরের জয়গান ? আঘাতের বিনিময়ে আধ্যাত্মিকতা ? মরণদশার আর দেরি কত ?

আহারাদির পরে আমরা সকলে শয্যাগ্রহণ করলাম। গাল-গল্পের উৎসাহ কম, সমস্ত দিনের মোটরে চড়ার ক্লান্তি। নিদ্রার আর অপরাধ নেই, শীতের রাত্রে লেপের মধ্যে আমাদের চক্ষু জড়িয়ে এলো।

রাত কত অনুমান করা কঠিন। কিসের যেন শব্দে ঘুম ভাঙলো। চোখ চেয়ে দেখি সবাই নিদ্রিত, আলোটা টিম টিম ক'রে জ্বলছে। ওদিকে দেখি বিছানায় দাদু নেই, তাঁরই পায়ের শব্দ এইমাত্র ঘরের বাইরে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কান পেতে শুনলাম মোটরের চাকা আর পেট্রলের শব্দ দূর থেকে দূরান্তরের অরণ্যপথে মিলিয়ে যাচ্ছে। মিঃ চৌধুরীর দলের সঙ্গে দাদু শিকারের সন্ধানে চ'লে গেলেন। এইটিই তাঁর সত্য পরিচয়। দুর্যোগে, অন্ধকারে, বিপদে ও বিপাকে তাঁর কোন শঙ্কা নেই।

মন ছুটলো তাঁদের গাড়ীর চাকার পিছনে পিছনে। কথাটা ভুলিনি যে, আমার 'শিকারের সন্ধানে' রচনায় উত্তেজনার চেয়ে বৈরাগ্যটা বড় জায়গা পেয়েছে। তার জন্য আমি লজ্জিত নই, কারণ আমার প্রাণের পরিচয় ঐখানেই। প্রবঞ্চনা নিজের কাছেও ভালো নয়, অন্যের কাছেও সঙ্গত নয়।

কিন্তু শক্তির প্রকাশ কি কেবল রাইফেলে, কেবল বন্দুকের অহঙ্কারে? হত্যা করার মধ্যেই আছে বীর্যবত্তা, আর আঘাত সহ্য করার ভিতরে কি প্রাণের বলশালীতার ভাগ এতই কম? অনেক সময় এই বিশ্বাসটা হারাই যে, হত্যার চেয়ে বড় কাজ হত্যাকে প্রতিরোধ করা, ধ্বংসের চেয়ে বড় কাজ সৃষ্টি, সংঘাতের চেয়ে বড় শান্তি।

পৃথিবীতে হানাহানি কম হয়নি। কাল-কালান্তব্যাপী চলেছে যুদ্ধ। মানুষকে হত্যার জন্য মানুষের হিংস্রতা চিরদিনই উদগ্র। লোভে, স্বার্থে, পরশ্রীকাতরতায়, বঞ্চনায় মানুষ নিত্যকাল ধ'রে অপরের উৎপীড়ন ক'রে চলেছে। সেই কি তার শক্তি, সেই কি তার বীর্য? অরণ্যের অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে রাইফেলের গুলীতে নিরপরাধ ব্যাঘ্রের বক্ষ বিদ্ধ করায় কি তস্করসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় নেই? একে বলবো শক্তি, একেই বলবো বীরত্ব? পৃথিবীর ইতিহাসে নীরো, নেপোলিয়ন, নেলসন, দুর্যোধন—এদের ঠাঁই আছে, আর বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, গান্ধী—এরা হয়ে থাকবে অপাংক্তেয়? এদের সহনশীলতার পিছনে কি ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির ইতিহাস নেই? এদের শান্তিবাদ মানবজাতির চিরকালীন প্রাণপ্রবাহের তলায় তলায় কি ভবিষ্যৎ গতিবেগ সঞ্চারিত করেনি?

বিনিদ্র রাত্রির নিঃশব্দ প্রহরগুলির ফলকে ফলকে আমার অসংখ্য প্রশ্ন জ্বল জ্বল ক'রে উঠতে লাগলো।

প্রভাতে দাদু ঘরে ফিরে এলেন। জানোয়ার পাওয়া যায়নি, তবে সুবিধা হোলো এই যে, দাদুর পথঘাট চেনা হয়ে গেল। গোটা তিন চার পথ আছে,—সম্মুখের পথটা মহাদেওস্থান নামক অরণ্যে প্রবেশ করেছে। এটা বাঘ-ভাল্লুকের অন্দর মহল।

প্রশ্ন করলাম, রাইফেলের গোটা-দুই আওয়াজ পেয়েছিলাম, সেটা কি?

ওঃ তাই বটে। দাদু বললেন, একটা সম্ভর মারা হয়েছে, আর কিছু পাওয়া যায়নি।—এই ব'লে তিনি তাঁর জাগরণক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিলেন। বৌদিদি নিযুক্ত হলেন তাঁর সেবায়।

প্রভাতের আলো ফুটে উঠল অরণ্যে অরণ্যে, রাঙ্গা রশ্মি নেমে এলো আমাদের ডাকবাংলার প্রাঙ্গণে। এমন বিস্ময় আমার চোখে আগে আর পড়েনি। এতবার অরণ্যে এসেছি, কিন্তু অরণ্যে দিবালোক দেখার ভাগ্য আমার ঘটে ওঠেনি। ঘটনাচক্রে সমস্ত সুস্পষ্ট ক'রে দেখবার সুবিধা পাওয়া গেল। বুকচাপা যে-আতঙ্কটা দীর্ঘকাল ধ'রে আড়ষ্ট ক'রে রেখেছিল, এই প্রভাতের আলোয় দেখলাম তার অনেকখানিই আমার অপ্রাকৃত কল্পনা! প্রভাতের কোমল সূর্যকিরণ এবং শীতের স্নিগ্ধ বাতাসে মনের জটিল গ্রন্থি শিথিল হয়ে এলো। অন্ধকারের আবিল জঠর থেকে যেন মুক্তিলাভ করেছি। উত্তরদিকে দূর প্রান্তরের প্রতি অবারিত দৃষ্টি প্রসারিত হোলো। দক্ষিণে অরণ্যময় পর্বত ধ্যানী ঋষির মতো নিস্তব্ধ আসীন, কুয়াসার জটা তখনো তাঁর মাথায় জড়ানো। নিকটে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী বালুপথে ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে,—কাছাকাছি গ্রামের দু একটি স্ত্রী-পুরুষ উঁচুনীচু পাড়ের উপর দিয়ে প্রত্যহের জীবনযাত্রার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভয় কোথাও নেই, বিঘ্ন নেই, বিপদ নেই। অন্ধকারে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, বিশ্বপ্রকৃতির অগণ্য বৈচিত্র্যের আমরাও যে এক-একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার বৃক্ষলতা, ফলমূল, পশুপক্ষী ও মানুষকে নিয়ে এক বিরাট সমন্বয় সৃষ্টি,—এই তত্ত্বটা অন্ধকারের মধ্যে ব'সে আমরা বিস্মৃত হই, পরস্পরকে অবিশ্বাস করি, সন্দেহ করি, বিচ্ছেদ ঘটাই। কিন্তু সূর্যদেবতার আবির্ভাবে আমাদের ভিতরে ঘটে পুনর্মিলন। অরণ্যকে অভিনন্দন জানাই, মানুষের সঙ্গে কোলাকুলি করি, পাখীর গান শুনি, নদীতে অবগাহন করি। তখন জন্তু-জানোয়ার তাদের হিংস্রতা নিয়ে গহন বনে আত্মগোপন করে।

প্রাতরাশ সেরে আমরা মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ধূলিকঙ্করময় পথ, তবু সে পথটা আজ সকালে বড় আপন, কারণ সেটা আমাদের দৃশ্য-গোচর। চাষীদের জীবনযাত্রা মধুর ব'লে মনে হচ্ছে। এখানে আজও যন্ত্রযানের আবির্ভাব ঘটেনি, এখান থেকে রেলষ্টেশন প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। গৃহপালিত পশুর সেবা, শস্য উৎপন্ন করা, জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করা, লোমজাত শিল্পের বাণিজ্য—এই এদের জীবিকা। নিকটে আকবরপুরের বিশেষ বিশেষ দিনে হাট বসে।

আমাদের গাড়ী অরণ্যে প্রবেশ করলো। যে অরণ্য কেবল অনুভব করেছি অন্ধকারে, যার রহস্যগন্ধে আমার প্রাণের মূল বারে বারে শিউরে উঠেছে, যার অচ্ছেদ্য আকর্ষণ আমাকে বারংবার কলিকাতার কর্মবহুল নিত্য জীবনের কোলাহল থেকে ছিন্ন ক'রে এনেছে, সেই অরণ্যকে স্পর্শ করলাম, তাকে স্পষ্ট ক'রে চিনলাম। হিমালয়ের তুষার তীর্থের পথে একটা চীরবাসা ভৈরব নামক এক পার্বত্য অরণ্যের কথা স্মরণ করতে পারি, পরিব্রাজক আমি সেদিন পথ হারিয়েছিলাম। রাজপুতনায় আবু পাহাড়ের তলদেশে বানাস নদীর পারে হৃষিকেশ জঙ্গলের কথা আজও ভুলিনি, ভুলিনি পরেশনাথের কথা। আজ দেখলাম এই অরণ্যের ভিতরে নানা ধাতুর খেলা,—কোথাও পলাশের লাল, কোথাও কুন্দের শুভ্রতা, কোথাও বা অপরাজিতার ঘন নীলিমা। বসন্ত কালের দেরি ছিল তবু এই অরণ্যতীর্থে ঝরাপাতার সরসরানি চলেছে, চলেছে শালবনের দীর্ঘ নিশ্বাস, ঝাউয়ের মর্মর, মধুলতার আশে পাশে মধুমক্ষিকার অশ্রান্ত গুঞ্জন। এখানে হিংসা কোথায়?

আরও অগ্রসর হলাম। দেখা গেল, এখানে এখনো প্রভাত এসে পৌঁছয়নি, লতাবিতানের শয্যায় শবরীকন্যার নিদ্রা এখনো ভাঙেনি। এখনো কলকূজনে অগণ্য পাখী ললিত কণ্ঠে বলছে, জাগো জাগো। নূতন জীবনে জাগো, তামসিক নিদ্রা থেকে জাগো, জাগো নবশক্তিতে, নবীন কর্মোৎসাহে! আরও অগ্রসর হলাম। উপলখণ্ডময় পথ উপর দিকে ধীরে ধীরে উঠে চলেছে, এই পথে শার্দূলরাজের নিত্য গতিবিধি। অভিজ্ঞ শিকারী ছাড়া ঠিক এইখানটিতে কেউ আসে না, এই সানুদেশ বড় বিপজ্জনক।

রিক্তহস্তে চলেছি, কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের ভয় প্রাণের মধ্যে এখনো দেখা দেয়নি। বিপদ এখানেও আছে জানি, কিন্তু ভয় নেই, ভয়ের জন্ম অন্ধকারে। সংশয়ের বাসা অস্পষ্টতায়, অবিশ্বাসের জন্ম আবিলতার মধ্যে। আজ প্রভাতের অরণ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই, তাই নির্ভয় সাহসে আমাদের পদক্ষেপ দ্রুতগতিশীল। অন্ধকারে আমরা এতদিন পদে পদে ভয় পেয়েছি, আলোয় এবার আমরা পায়ে পায়ে জয় ক'রে চলেছি। আজ জয়ের আনন্দে বুকের মধ্যে অজেয় সাহস সঞ্চারিত হয়েছে, অধ্যবসায় এখন বাধাবন্ধনহীন।

পাহাড়ের উপরে উঠলাম। স্নিগ্ধ ছায়াময় শিলাতল, নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায় চারিদিক প্রসন্ন। কাছাকাছি কোথাও জলধারার অবিশ্রান্ত পতনের শব্দে এক স্থানে সেই নীরবতা মুখর হয়ে উঠেছে। নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখা গেল, পর্বতের উচ্চশীর্ষ থেকে একটা বিস্মৃত জলধারা সশব্দে ঝাঁপিয়ে অনেক নীচে পড়ছে। সেই জলে সৃষ্টি হয়েছে একটি নীলাভ সরোবর। সরোবরের চারিদিকে শিলাপ্রাচীর, পর্বতগাত্রগুলি বৃক্ষজটায় ফাটলধারা—অনেকটা যেন প্রাচীন কালের মুনির আশ্রম-তপোবন। দাদু বললেন, এর নাম কোকলৎ জলপ্রপাত। এখানে বাঘেরা জলপান করে।

পরিশ্রমে আমরাও তৃষ্ণার্ত। সেই নীল সরোবরের স্নিগ্ধ জল আমরা অঞ্জলি ভ'রে পান করলাম। জলধারার দ্রুত পতনের জন্য শীতল বায়ুর সৃষ্টি হয়েছে এখানে, সেই বাতাসে আমাদের শ্রান্ত শরীর জুড়িয়ে এলো। একখানা পাথরের উপরে আমরা সকলে বসলাম। শ্রদ্ধানত নীরবতায় কারো মুখে আর কথা নেই—আমরা যেন কোন অলক্ষ্য তপস্বীর আসনের চারিদিকে সমবেত হয়েছি।

দ্বিপ্রহরে সেদিন আবার বাহির হলাম। অরণ্যের যা কিছু গোপন ইতিহাস, যা কিছু অস্পষ্ট তথ্য তার প্রতি আমাদের যেন একটা লোভ জন্মেছে। আবিষ্কারের আনন্দে আমরা দুই বন্ধু তেওয়ারীকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। হাতে অস্ত্র নেই, কিন্তু বুকে সাহস আছে। যেখানে বাঘের পায়ের দাগ, যেখানে ভাল্লুকের চলাফেরা আর বন্য শূকরের আনাগোনা, তার সঙ্গে লেপার্ডের উৎপাত, সেইদিকেই আমাদের গতি। জানোয়ার না দেখলে, বিপদকে মুখোমুখি না দেখা গেলে আর আমাদের স্বস্তি নেই। গহন অরণ্যে প্রবেশ করলাম। কাঁটালতা, বাবলা বন, ঝোপঝাড়, বালু ও পাথরময় জলধারাপথ—সমস্ত অতিক্রম করতে করতে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছি। মানুষের পায়ের দাগের পাশে পাশে বাঘের অসংখ্য পদচিহ্ন—এক গহ্বর থেকে অন্য গহ্বরে সেগুলি মিলিয়ে গেছে। আমরা বিপদের গুরুত্ব অনুভব না ক'রে সেদিন মহাদেওস্থানের সমস্ত জলটা পরিভ্রমণ ক'রে অপরাহ্ণের দিকে ফিরে এলাম।

শেষের কথা সামান্যই। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে আমরা সদলবলে আবার

ক নূতন জঙ্গলের অভিমুখে রওনা হলাম। মিঃ চৌধুরী আগে থেকেই জঙ্গলে মাচা বাঁধার বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলেন। তাঁদের গাড়ীতে গেছে রবী আক্তার। আমাদের গাড়ী ছিল পিছনে পিছনে, কিন্তু মাঝপথে একটা লায় গাড়ীর চাকা আটকালো, সুতরাং সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে প্রায় দেড় ইল অরণ্য সীমানা আমরা পায়ে হেঁটে গেলাম। আমাদের কাছে দুটো গ্নেয়াস্ত্র ছিল।

নূতন যাত্রী আমরা, অভিজ্ঞতাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু মিঃ চৌধুরীর দল মাদের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। কোথায় চা বাঁধা হয়েছে, কোন্ পথ দিয়ে গেলে আমরা তাঁদের কাছে পৌঁছতে বো, গুলী ছোঁড়া হবে কোথা থেকে কোন্ দিকে—কোনো হদিশ না পেয়ে মরা উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে গেলাম। ওদিকে আমাদের পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই ঙ্গলে 'ঝালাও' শুরু হয়েছে। ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টা, মানুষের চীৎকার আমরা নতে পাচ্ছি, এখনই হয়ত অতর্কিতে ভয়ার্ত কোনো পলায়মান জানোয়ারের রা আক্রান্ত হ'তে পারি, কিন্তু নিরুপায় অসহায়তায় আমরা পাগলের তো সেই জঙ্গলে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলাম। ঘর্মাক্ত লেবরে দাদু এক সময়ে মুখ ফিরিয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন, সুধীন্দ্র, বন্দুকে গুলী ভরা আছে ত? শিগগির—না না, ওদিকে—শিগগির—এই যে, এই ছটায়, আচ্ছা তোমরা আগে ওঠো।

আমরা গাছে উঠলাম, হাত পা ক্ষতবিক্ষত হোলো। দাদু রাইফেল নিয়ে নীচেই দাঁড়ালেন, অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মিঃ চৌধুরীর উদ্দেশে বললেন, ইপোক্রিট্, সেল্‌ফিশ!

এমন সময় একজন 'বীটার'কে দেখা গেল। দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, চান্ কিধার হ্যায়?

সে কহিল, আইয়ে দেখায়েঙ্গে।

গাছ থেকে নেমে তিনজনে তার সঙ্গে ছুটলাম। মাচা না হ'লে আমাদের কোনো ক্রমেই নিরাপত্তা নেই। 'ঝালাও' হবার কালে পায়ে হেঁটে গেছে কোনো মানুষ কোন দিন বাঁচেনি, আমাদের এই অসমসাহসিকতাকে বুদ্ধিমান লোকে বলবে, আত্মহত্যার পাগলামি। আমরা ছুটছি,—পাথর, গাছ,

কাঁকর, উঁচু-নীচু, খানা-ডোবা; নালা-নদী ডিঙ্গিয়ে—প্রাণভয়ে ছোটার চেহারা বোধহয় এই। মাঝে মাঝে জঙ্গল বিদীর্ণ ক'রে অলক্ষ্য অদৃশ্য, জানোয়ার পলায়ন করছে,—যে কোনো মুহূর্তে তাদের পথে বাধা সৃষ্ট ক'রে আমরা প্রাণ হারাতে পারি। দূর উত্তর দিকে সকলে ভীষণ চীৎকার ও ঢাক বাজনা পিটিয়ে জানোয়ার বা'র করবার চেষ্টা করছে। যারা চীৎকার করছিল তারা অরণ্যবাসী নরনারী—তারা প্রত্যেকে আছে দলের মধ্যে দলছাড়া হলেই আক্রান্ত হবে এ তারা জানে। সম্মিলিত স্ত্রীপুরুষের ভয়ে জানোয়ার বিপরীত পথে যখন পালাবার চেষ্টা করে তখন সেই পথের উপর কোনো বৃক্ষচূড়ার মাচা থেকে তাদের প্রতি গুলী করা হয়। আমরা তাদের সেই পালাবার পথে দুর্ভাগ্যক্রমে প'ড়ে গেছি।

অবশেষে প্রায় আধঘণ্টা পরে একটা মাচা পাওয়া গেল। পরিশ্রমে আমরা মৃতবৎ। মরীয়ার মতো মাচায় যখন লাফিয়ে উঠলাম, তখন সেখানে হবিবকে পাওয়া গেল। সেও মিঃ চৌধুরীর ব্যবহারে অতিশয় ক্ষুব্ধ।

দুড়ুম! দুড়ুম!!

রাইফেলের আওয়াজ পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হোলো। আমরা কিছুই দেখলাম না, কেবল কানে শুনলাম। সেই আওয়াজের কয়েক মুহূর্ত পরেই জন্তুর পায়ের খটাখট শব্দ শোনা গেল। আমরা বন্দুক তুলে রইলাম। কিন্তু জানোয়ার সেদিকে এলো না, অন্য পথ দিয়ে অন্য পথে ছুটলো। কি ওটা? বাঘ, ভাল্লুক, শূকর, না আর কিছু?

সমস্ত ব্যাপারটা কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটে গেল। আমাদের কারো মুখে আর কথা নেই। ভয়ে, পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে, ক্ষোভে আমরা তৎক্ষণে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, এমন সঙ্গীর সাহচর্যে আর কখনো শিকারে আসবো না। শিকার আমরা ছেড়ে দেবো। মিঃ চৌধুরীর নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা আমরা চিরদিনই স্মরণ করে রাখবো।

কিন্তু মন তখন নিজের কাজ ক'রে চলেছে। মধ্যাহ্ন সূর্যালোকে অরণ্যের অন্ধ্র রন্ধ্র লক্ষ্য করছি, এখন বিস্ময় আর রহস্য কোথাও নেই—এমন স্বচ্ছ, সহজ ও সুস্পষ্ট ঘন অরণ্যানীর চেহারা আমরা এর আগে আর কল্পনা করিনি। যা ছিল অজানা আর অজ্ঞাত, যা আমাদের বোধশক্তির

মার বাইরে প'ড়ে ছিল, চেতনার ভিতরেও যার সুস্পষ্ট ছায়া কখনো
তিভাত হয়নি—তাকে দিবালোকে পরিচ্ছন্ন রূপে দেখে নিলাম, এবং পরে
ার বিস্ময় রইলো না। এর পরে পুনরায় অরণ্যে আসবার দুর্দমনীয়
াগ্রহ আর হবে না। খুব সম্ভব এবারের মতো শিকারের সন্ধানে
তায়াত এইখানে সমাপ্ত করবো। নূতন আকর্ষণের দিকে মন টানছে।
মন কিছুর দিকে, যা জানা যায় না, যার মোহ শেষ হয় না, যাকে জানতে
ানতে সমগ্র জীবন ক্ষয় হয়ে যায়।

অপরাহ্ন হয়ে এলো। বহুক্ষণ ঝালাও করা সত্ত্বেও জানোয়ারের আর
ন্ধান পাওয়া গেল না। আমাদের উৎসাহ ও রুচি অনেকটা কমে এসেছে।
াকটে জঙ্গলের পাশে পাশে একটা গণ্ডগোল শোনা যাচ্ছিল, হবিব বললে,
াসুন আমরা নামি, মাচার উপর থাকা মিথ্যে, আর কোথাও কিছু নেই।

অতি সন্তর্পণে আমরা মাচা থেকে নামলাম। ডাকবাংলায় ফিরবার
ন্য মন অধীর হয়ে উঠেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম বন্ধু সুধীন্দ্রের মুখ
ন্ধকারে ও ক্লান্তিতে মেঘাচ্ছন্ন।

গোলমালের মাঝখানে এসে সকলকে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মিঃ চৌধুরী
িগারেট ধরিয়ে তাঁর সঙ্গী ও নবী আক্তারের সঙ্গে নিশ্চিন্তে আলাপ
রছেন। আমরা জীবিত কি মৃত তার খোঁজ রাখাও তিনি প্রয়োজন মনে
রেননি। এবার দাদুকে দেখে তিনি ইংরাজিতে বললেন, কোন্ মাচায়
ছলেন আপনারা?

দাদুর চাপা অভিমান ও অন্তর্দাহ এতক্ষণে প্রকাশের পথ পেলে। উত্তরে
ললেন, আপনারা ত আমাদের খোঁজ রাখেননি! কি হে আক্তার সাহেব,
বব কি তোমার? আমাদের খোঁজ নিতেও নেই? জানো, তোমার
রনাতেই আমরা এসেছি এদেশে?

নবী আক্তার নীরব, অপরাধী মন তার, আলোচনাটা আর সে
একদূর অগ্রসর হতে দিল না। তাছাড়া ভগবানদত্ত সুবিধাটা ছিল
াব সহায়। কানে সে শুনতে পায় না।

সম্মুখে এক বিরাট সম্ভর মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তাকেই ঘিরে
অসংখ্য জংলী স্ত্রীপুরুষ কোলাহল কলরবে মুখর। বাঘ নয়, এটা ছিল সেই

পলায়মান জানোয়ার। চৌধুরীর গুলাতে মারা পড়েছে। রক্তের ধার তখনো তার পাঁজরের ফুটো দিয়ে নির্গত হচ্ছিল।

গাছের ঝিলমিলি ছায়ায় অপরাহ্ণের রাঙ্গা রৌদ্র অরণ্যের রন্ধ্র-পথে নেমে এসেছে। মৃত জানোয়ারটার দিকে চেয়ে ভাবলাম স্থূল মাংসের লোভে আমরা শিকারে আসিনি, আমাদের মনে ছিল অন্য কথা। এই অসাড় দেহ নিয়ে এরা কি করবে?

চৌধুরী বললেন, আপনারা এটাকে নিয়ে যান।

মন বললে, না। রক্তেও প্রয়োজন নাই, মাংসেও না? এই অরণ্যশিশুকে নিয়ে আমরা কোথায় যাবো?

কিন্তু আমাদের প্রয়োজন না থাকলেও সমবেত অরণ্যবাসীদের প্রয়ো ছিল। সম্ভরটাকে সেখানে ছোরা দিয়ে কেটে ফেলা হলো। নানা পা তার শরীরের রক্ত ও অন্ত্রতন্ত্র মেয়ে-পুরুষরা সংগ্রহ করে নিয়ে তাদের ঘরে দিকে যাত্রা করলো। এই রক্তে নাকি তারা নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করে।

নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত, উদাসীন ও ক্লান্ত সুধীন্দ্র এবং আমি একাধারে দাঁড়িয়ে এই রক্তোৎসব লক্ষ্য করছিলাম। পুরুষ ও মেয়েরা চলেছে দ দলে, সেই পথের উপরে, শিলা-খণ্ডের উপরে পড়েছে ওই জানোয়ারের অসংখ্য রক্তবিন্দু। সকলের পিছনে পিছনে আমরাও অগ্রসর হলাম আজ আমাদের শেষ শিকারযাত্রা, হয়ত আর কোনো দিন আমাদে উৎসাহ হবে না।

কিছুদূর এসেছি, দেখি একটি কৃষ্ণকায়া অল্পবয়সী জংলী মেয়ে তখনও একখানি পাথরের উপর ব'সে রয়েছে। তার উৎসাহ সামান্য, সে তার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণের মতো রক্ত ও অন্ত সংগ্রহ করেনি, সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সুধীন্দ্র তার দিকে ফিরে তাকালেন। নতমস্তকে মেয়েটি একখান পাথরের উপর হিজিবিজি আঙুল বুলিয়ে চলেছে, কোনদিকে তার লক্ষ্য নেই। দেখলাম সেই পাথরখণ্ডটার মৃত জানোয়ারের কয়েক ফোঁটা রক্তবিন্দু আর সেই বিন্দুগুলির উপর অঙ্গুলি চালনা ক'রে সেই অরণ্যবাসিনী কি যেন ইচ্ছা মতো এক আঁকাবাঁকা দুর্বোধ্য ভাষায় আঁক কেটে চলেছে। সেই লেখা কি, কেমন সে ভাষা, কি তার বক্তব্য, কা'র কাহিনী রচনা করছে,

আমরাও জানিনে, মেয়েটিও জানে না,—হয়ত জানে সেই শিলাখণ্ডের অন্তরাত্মা,—হয়ত জানে বৎসহারা বনদেবীর আর্ত প্রাণ! প্রস্তরফলকে লেখা রইল নিরপরাধের মৃত্যু ইতিহাস।

অবসন্ন মনে আমরা সেদিন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম।

রামায়ণের সেই অংশটা মনে পড়ছে, বানর সৈন্যদলের কোলাহলে লঙ্কাযাত্রার দীর্ঘ পথ ছিল মুখরিত! কিন্তু তা'রা যখন সমুদ্রপথে এসে পৌঁছলো, তখন সবাই চুপ। সমুদ্রের মহিমা বিস্তার, তরঙ্গভঙ্গ, অন্ত-হীনতা,—সমস্ত মিলিয়ে বিস্ময়-স্তব্ধতা! ওখানে মানুষের ভাষা অতি সামান্য।

অরণ্যের বেলায়ও তাই। জলপাইগুড়ি শহর থেকে আমরা যাত্রা করেছিলুম। বেলা মধ্যাহ্ন। মোটর গাড়ীখানা নতুন। সঙ্গে আছেন একজন বাংলা ভাষার অধ্যাপক। আনন্দচন্দ্র কলেজে তিনি পড়ান। ক্ষমা করবেন, তাঁর নামটি আমার মনে থাকা উচিত ছিল। তিনি ছাড়া সঙ্গে আছেন অতি উৎসাহী, ভদ্র এবং মিষ্ট স্বভাব কয়েকজন ছাত্রবন্ধু। বেশ একটি দল হয়ে উঠেছিল আমাদের সবাইকে নিয়ে। কিন্তু কথা ছিল এই, সন্ধ্যায় ফিরে এসে অবশ্যই সাহিত্যসভায় যোগদান করতে হবে। ব্যাপারটা হোলো এই যে, সাহিত্যসভাটাই মুখ্য, ভ্রমণটা গৌণ। কিন্তু আমি মনে মনে জানতুম, কোনটার মূল্য আমার কাছে কতখানি।

শীতের শেষদিকে, তখনও বসন্তকাল এসে পৌঁছয়নি। দুই ধারের প্রান্তরে তখনও ছিল অসাড়তা। গুল্মলতায় সবেমাত্র নতুন রং ধরেছে, কিন্তু ফুল এখনও আসেনি। মধ্যাহ্নকালে জলপাইগুড়ির প্রান্তরপথে বাতাস তখনও সুস্নিগ্ধ। যে দিকে অরণ্যপথ সেই দিকেই আমাদের গতি সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের কোলাহল মুখরিত পথ এসে শেষ হোলো বেল্লাকোপা ষ্টেশনে। জলপাইগুড়ি থেকে আন্দাজ সতেরো মাইল। রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে নিজেদের তুলনা দেওয়াটা হয়ত খুব শ্রুতি সুখকর হয়নি, এবং আমার এ লেখাটুকু তাঁদের চোখে না পড়লেও চলবে। তবে কিনা ওই যাত্রাটায় আমাদের নিজেদের আনন্দোচ্ছ্বাস ছিল প্রবল।

বেল্লাকোপা ষ্টেশন পেরিয়ে যে পথ আমরা ধরলুম সেটা হোলো শিকারপুরের পথ। মাষ্টার মহাশয় বললেন, তিনি অনেককাল জলপাই-

গুড়িতে আছেন, কিন্তু এ পথে এই প্রথম। তা ছাড়া জীবনে তিনি অরণ্য দেখেননি কোনদিন। আজ তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা। একটি জিনিস লক্ষ্য করছিলাম, ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মতো তাঁর সম্পর্ক। একালে ছাত্রজগতের হাওয়া খারাপ সবাই জানে। অনেক স্থলে নাকি ছাত্র আর অধ্যাপকগণের মধ্যে সিগারেট বিনিময় হয় শুনেছি। শুনেছি রাজনীতিক মতবাদ নিয়ে ইদানীং অনেক স্থলে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে দলাদলি। সেজন্য উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্কটা আজকাল প্রায়ই চেষ্টাকৃত। কিন্তু এখানে আমাদের এই দলের এমন একটি মিষ্টি সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলাম যেটির মধ্যে শিক্ষা-লাভের ক্ষেত্র ছিল।

এটি শিকারপুরের পথ। পথ নিরবিলি। লোক বসতির আভাস কম। বড় বড় গাছে জটলা পাকিয়ে এবং লতাগুল্ম জড়িয়ে জঙ্গল জটলায় সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে 'বাহে'-দের দলকে আনাগোনা করতে দেখেছি। এরা হল জলপাইগুড়ির অধিবাসী। কোচবিহারে যেমন 'কোচ'-দের দেখেছিলুম। এরা থাকে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে,—এদের সমাজব্যবস্থা ঘর দোর সবই আলাদা ধরণের। 'সভ্য সমাজ' থেকে এরা অনেকটা পৃথক। দেশের যে রকম দুর্গতি তা'তে এদের কেউ তাতিয়ে তুললেই 'মাইনরিটি'র কচকচি! দেখতে দেখতে আমাদের পথ যে কেবল জনশূন্য হোলো তাই নয়, এমন একটা নরীবতা দেখা দিল যেটা অরণ্যেরই প্রকৃতি। এপথ দিয়ে মাঝে মাঝে লরী পেরিয়ে যায়। তা'রা হোলো অদূরবর্তী চা বাগানের শ্রমিক, জঙ্গলের চাষী অথবা পি-ডবলু-ডির কুলি-মজুর। মানুষ জন কোথাও কেউ এ অঞ্চলে আছে কিনা দেখার জন্য মাষ্টার মশাই ঘন ঘন উৎসুক চক্ষে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। জনশূন্যতাটা তাঁর জানা অভ্যাস ছিল না।

শিকারপুরের চা-বাগানে আমাদের গাড়ী এসে পোঁছলো। আমরা রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের জমিদারীর মধ্যে আছি। তিনি বর্তমানে বেঁচে নেই, এখন তাঁর স্ত্রী আছেন, রাণী অশ্রুমতী দেবী। আমি প্রায় আড়াই বছর আগেকার কথা বলছি। ইতিমধ্যে অশ্রুমতীও লোকান্তরিত হয়েছেন। শুনলাম রাজার নাকি আর এক পত্নী বর্তমান, তবে তিনি নাকি অবাঙ্গালী। এসব রাজ-রাজড়ার ব্যাপার। আর কোনো স্ত্রী তার আছেন কিনা এখনও

আমি শুনিনি। শুনেছিলাম জয়পুরের মহারাজার নাকি চল্লিশ জন স্ত্রী এবং একশো বাইশটি সন্তান। সম্প্রতি বছর সাতেক আগে ভারত স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশীয় রাজ্য নিয়ে যখন তোলপাড় চলছিল, তখন জনৈক রাজার খবর জানা গিয়েছিল, তাঁর নাকি পঁচিশ জন পত্নী আছেন। সম্ভবত সে-রাজ্যের প্রজা মাত্রই তাঁর সন্তান ব'লে পরিচিত। আমি মনে করি, কোনো রাজার পক্ষে তিনশো পঁয়ষট্টি জনের বেশী স্ত্রী থাকা সঙ্গত নয়!

শিকারপুর চা বাগানে এসে ঐশ্বর্য ও সম্পদের চেহারা দেখে মাষ্টার মশাইয়ের বিস্ময়ের সীমা নেই। বনজঙ্গলের মধ্যে এমন আধুনিক জীবন-যাত্রার উপকরণ বাহুল্য তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। বোধহয় আগে থেকে কেউ খবর দিয়ে থাকবে যে, আমাদের দল আসছে। সুতরাং ম্যানেজার মশায় এসে সকলকে অভ্যর্থনা ক'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বিলাসদ্রব্যের অভাব কোথাও নেই। সাজসজ্জা, আসবার-পত্র, শাওয়ার বাথ, ডাইনিং হল, ফুলের কেয়ারি করা লন্, বিদ্যুৎচালিত বিভিন্ন আরামের উপকরণ, অর্থাৎ প্রতি পদে রাজা ও রাণী—মানে অশ্রুমতীর সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয়। আমাদের জন্য যে পরিমাণ রুচিকর আহার্যবস্তুর আয়োজন করা হয়েছিল, সে কেবল চা-ব্যবসায়ীদের পক্ষেই সম্ভব। আমার বিশ্বাস আহারাদির ব্যাপারে পাঞ্জাব এবং বাঙ্গলার রুচি-বোধ ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। খাদ্যের ব্যাপারে শৈব অপেক্ষা শাক্তরুচিতেই আমার আস্থা বেশী।

আমরা অরণ্যভ্রমণে বেরিয়েছি, অতএব তাড়া ছিল। আমরা যাবো বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য। শিকারপুরের চা বাগানের প্রায় ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর আবার চললো। মাঝে মাঝে আমরা শুকনো ঝরণার পাশ কাটিয়ে চলেছি। দুপাশে শাল আর সেগুনের বন। কেঁদ, শিশু, সুন্দর—সব রকমের গাছই রয়েছে দুধারে। কোথাও কোথাও উপত্যকার মতো, কোথাও বা চাষ আবাদের পাশ দিয়ে চলেছে অরণ্যের সীমানা। বৈকুণ্ঠপুর হোলো দশ মাইল পথ।

চা-বাগানের সঙ্গে অরণ্যের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কেননা বাঙ্গলার উত্তরে

অধিকাংশ চা-বাগানই হোলো হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে। ঢালু অঞ্চল হওয়া চাই, বৃষ্টি চাই—কিন্তু জল দাঁড়ালে চলবে না; ফলন চাই পর্যাপ্ত; রৌদ্র চাই, তবে ছায়াও চাই। অরণ্য সেই ছায়া-শীতলতা আনে। তাছাড়া প্রত্যেক চা-চাগানেই পাওয়া যায় অসংখ্য ছত্রধারী 'রেইন টি।' তা'রা কেবল যে ছায়া দেয় তা নয়; উপযুক্ত বাষ্প বিতরণ করে, এবং দূষিত বাষ্প টানে। চায়ের গাছ বাঁচে সুদীর্ঘকাল, কিন্তু চিরজীবন সেবা চায়। সে সুখীশ্রেষ্ঠ।

বনজঙ্গল ঘন হয়ে আসছে। ছাত্রবন্ধুরা পথ মুখরিত ক'রে রেখেছিল এতক্ষণ, এবার তা'রা অনেকটা যেন শান্ত। অরণ্য তা'র স্বরূপ ও ভাষা প্রকাশ করেছে। ভাষা কি ভাষ্য ঠিক বুঝিনে। স্তব্ধতার সঙ্গে দুর্ভাবনা আছে জড়িয়ে। সবাই ঠিক কি দেখছি জানিনে, কিন্তু কিছু দেখতে চাচ্ছি। ছেলেদের চোখ ঘুরছে অরণ্যের ভিতরে, প্রতি লতাপাতার আশে পাশে। কিছু খুঁজছে তা'রা, কিছু সঙ্কেত, কিছু ইশারা। শুকনো ঝরা পাতার ভিতর দিয়ে সরীসৃপ পেরিয়ে গেলে তা'র আওয়াজে উৎকর্ণ সবাই। মাষ্টার মশায়ের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ড্রাইভারের দিকে। ড্রাইভার হোলো এখানের পরম বন্ধু। পথ বন্ধুর। উঁচু নীচু পথে গাড়ী চলছে। সূর্যের আলো হারিয়ে গেছে অরণ্যের মধ্যে। দূর থেকে দূরে ক্বচিৎ ডেকে যাচ্ছে পাখী, কোনো জন্তুর সুদূর অপরিচিত কণ্ঠস্বর,—একটুখানি বাতাসের সরসরানি,—অমনি সকলে সজাগ। আমাদের কারো মুখে কথা নেই। কথা শোনো স্তব্ধতার মধ্যে, যদি কান থাকে। চেতনা সূচ্যগ্রবৎ ধারালো হয়ে উঠছে সকলের! যে পথ দিয়ে যাচ্ছি, পিছন দিকে সেটা আঁক-বাঁকা হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, সামনের পথটাও ছায়াচ্ছন্ন। হাতঘড়িটি ছাড়া সময়টা জানবার আর কোনো উপায় নেই।

অরণ্যের ভয়াবহতা প্রকাশ পায় দুই কারণে। এক, যদি সহসা সামনে এসে হিংস্র জানোয়ার দাঁড়ায় অতর্কিত নিরস্ত্র পথ-চারীর সামনে। দুই, অপরিচিত বনভূমিতে যদি সন্ধ্যার অন্ধকার আসে ঘনিয়ে। ভয় ততক্ষণ, ভয়কে যতক্ষণ দেখিনে! বিপদ দেখে ভয় পাইনে, বিপদ যখন কেটে যায়। মৃত্যু যখন ঘনায়মান হয়, তখনই মৃত্যুভয়। মৃত্যু দেখলেই মৃত্যুভয় কাটে।

অনেক সর্পভীরুকে দেখেছি বিষধর সর্প দেখার পর আতঙ্ক তা'র ক'মে গেছে। অনেক নিরীহ প্রকৃতির লোক বন্য বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রে বাঘকে হটিয়ে দিয়েছে, এমন সংবাদ জানি। তা'রা আর সহসা বাঘের ভয় পায় না। বজ্রপাতের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

"এই তুমি,
এর বেশী তুমি নয়?
চ'লে গেল ভয়!"

মাষ্টার মশাই সহসা কম্পিত কণ্ঠে বললেন, মোটরে পেট্রল যথেষ্ট পরিমাণে আছে ত?

ড্রাইভার বললেন, আমিও সেই কথা বলছি স্যর, পেট্রল যা আছে তা'তে আর চলছে না!

তবে?—সহসা মাষ্টার মশাই আর্তনাদ করলেন।

ছেলেরা চুপ। আসবার সময় অতটা কেউ চিন্তা করেনি। এটা ভুল হয়েছে সবাই স্বীকার করলো। কিন্তু বর্তমানে উপায় কি?

অধ্যাপক মশাইয়ের কপালে আঠা আঠা ঘাম দেখা দিল। এবার তিনি সংযম হারালেন। ক্ষেদোক্তি ক'রে বললেন, ছাত্ররাই দেশটাকে ডোবালে! যদি একটা কিছু বেরোয়, বলুন ত, কি হবে?

শান্ত করবার জন্য বললুম, আপনি ত এখনো অবিবাহিত আছেন, মাষ্টার মশাই? ভয় কি?

মানে? হাঁ, তা অবিশ্যি সত্যি! তবে কি জানেন, কেউ ত জানলো না কোথায় রইলুম! আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে ব্যাপারটা—

একজন বললে, আমরা ত মোটরের মধ্যেই আছি, মাষ্টার মশাই?

মোটরের মধ্যে? খবরের কাগজে পড়োনি লামডিংয়ের হিল্ সেক্শনে হাতী নেমে ট্রেন উল্‌টে দেয়! মোটর কতটুকু! ওই ত সন্ধ্যে হ'য়ে এলো!

বললুম, এখন বেলা তিনটে!

তিনটে!—মাষ্টার মশায়ের মুখগহ্বর থেকে কাতর আওয়াজ বেরিয়ে এলো,—তবে রাত দশটা কেমন? বারোটা? রাত দুটো? আপনি

আমাদের সম্মানিত অতিথি, কিন্তু বোধ হয় এসব ছেলেদের নিয়ে আমার আসা উচিত হয়নি!

কচি কচি লাল পাতা এসেছে শাল-সেগুনে। মাঝে মাঝে গুনগুনিয়ে যাচ্ছে পতঙ্গ। সূক্ষ্ম বন্য গন্ধ পাচ্ছিলুম আশে পাশে। পত্র পল্লবের ভিতর দিয়ে কোথাও কোথাও রক্তিম আভা চোখে পড়ছে। কোথাও নেমেছে বিশাল বৃক্ষ থেকে শিকড় পাকানো লতার ঝুরি। কোথাও ডাঁটায় ধরেছে মস্ত কোরক। এখানে ওখানে ঝিল্লি মুখরিত অন্ধকারের দল। মনে আশঙ্কা যদি না থাকে তবেই চোখে পড়বে অরণ্যের সত্য চেহারা। অরণ্য নিস্তব্ধ বটে, কিন্তু চুপ ক'রে সে নেই। সে নিত্য ক্রিয়াশীল। মৌচাক বোনা চলছে গাছের ডালে। কুঁড়িরা অস্থির হয়ে উঠেছে। প্রজাপতিরা বেরিয়েছে; পতঙ্গদলের মধ্যে গোয়েন্দাগিরি চলছে। এক ঋতুর পাখীরা বিদায় নিচ্ছে, বসন্ত সমাগমের সঙ্গে আসছে অন্য পাখী। শীতের কীট আর সরীসৃপরা যাচ্ছে কোটরে, বেরিয়ে আসছে বসন্তের কীট পতঙ্গরা। কেউ স্থির নেই, প্রত্যেকে সক্রিয়। মধু আসবে ফুলে, মক্ষীরাণীর প্রজাতন্ত্রের টনক নড়েছে। কিশলয় হবে রাঙ্গা, কীটের দল তৎপর। পাখা গজাবে পতঙ্গের,—রঙ্গীন উর্ণনাভরা লক্ষ্য রাখছে। নতুন বৃন্ত গজিয়ে উঠবে, লাল পিপীলিকারা খোঁজ খবর করছে। কেউ ব'সে নেই। চোখে দেখছি সমগ্র অরণ্য নিস্তব্ধ, কাজ চলছে ভিতরে ভিতরে। দেখতে পাচ্ছি জনহীন, কিন্তু প্রাণীহীন কোথাও নয়। ওদের ভাষা শুনতে পাইনে, কেননা সেই কান নেই। ওদের মধ্যে বাস করিনে তাই ওরাও আমাদের দেখলে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। আমরা দেখছিনে কোনো প্রাণীকে, কিন্তু সবাই দেখছে আমাদের। আলোতে আমরা ওদের কাছে প্রকট, অন্ধকার রাত্রেও ওদের চোখে আমরা দৃশ্যমান। মানুষ অরণ্যকে ভালোবাসে না, তাই অরণ্য ভয় দেখিয়ে তাড়ায়। অরণ্য হোলো আমাদের হিংস্রতা প্রকাশের ক্ষেত্র, অরণ্য সেকথা জানে। প্রাণীকণ্ঠের কলরবে নিত্য মুখর হলো বনভূমি, কিন্তু হিংস্র মানুষ তা'র মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেই সে রুদ্ধকণ্ঠ। অরণ্যের হৃদয়ে আঘাত করলেই সে বর্বর হয়ে ওঠে। তাড়না করলেই বিতাড়িত হ'তে হয়। ভয় দেখালেই ভীতিজনক হয়ে ওঠে। সেইজন্য পা টিপে টিপে যেতে হয় অরণ্যের মাঝখানে। কোনো প্রাণী না জানে, কেউ না শোনে।

স্তব্ধ হয়ে অরণ্যের ঐকতান কানে নিতে হয়। তাল দিতে নেই,—ওদের তালে মিলবে না। বাঘের সঙ্গে বানর, পাখীর সঙ্গে সরীসৃপ, ভালুকের সঙ্গে বনকুকুর, হাতীর সঙ্গে কাকার—ওদের একই তান, একই তাল। তা'র মাঝখানে কোনো আওয়াজ করতে নেই যেটা ওদের কানে নতুন ঠেকে। অপরিচিত আওয়াজে ওরা চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে যায়, ওদের মনে আসে চাঞ্চল্য। তাই ওরা যখন গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে এদিক থেকে ওদিকে, তখন মারা পড়ে শিকারীর হাতে। প্রত্যেক শিকারীকে এজন্য নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতার সাধনা করতে হয়। অনেক শিকারীর সঙ্গে থেকেছি ব'লেই এসব-গুলো জানতে পেরেছি।

শীতের শেষ দিক হলেও বেলা অপরাহ্ণ হয়ে এলো। অরণ্যের ঘন সমাচ্ছন্নতার মাঝখানে এবার কতকটা অবকাশ পাওয়া গেল। অল্প পরিসর হলেও জায়গাটা ফাঁকা। এখানে নেমে একটু বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। ছাত্রবন্ধুরা নামলো, এবং সকলে মিলে ছবি তোলা হোলো।

মাষ্টার মশাই নামতে পারেননি কারণ তাঁর শরীর আড়ষ্ট। অপরিচতি অঞ্চলে সহসা পদার্পণ করাটাও যুক্তিসঙ্গত নয়! এ মাটি নতুন। ছুটতে গেলে পাথুরে ঢেলার ওপর হোঁচট খাবার ভয়। তাছাড়া তিনি খর্বকার মানুষ, উনি কোনো আরণ্যক প্রাণীর লক্ষ্যবস্তু হন্ এটা পছন্দসই নয়। কিন্তু মুস্কিল এই, পেট্রল কম পড়েছে, গাড়ী আর যাবে না। তবে ভয়ের কারণ নেই। এটা হোলো বৈকুণ্ঠপুরের উত্তর সীমানা, এর পরেই হোলো সরস্বতীপুর। সেখানেও মস্ত চা-বাগান। ওই চা-বাগানের দূর-প্রান্তর পেরোলেই হিমালয়ের পাহাড়তলী। সেজন্য বৈকণ্ঠপুর অপেক্ষা সরস্বতী-পুরের আশপাশে জন্তুজানোয়ারের উৎপাত কিছু বেশী।

অদূরে ঝোপজঙ্গলের ধারে এতক্ষণ পরে একখানি মাত্র চাষীর ঘর পাওয়া গেল। সামনের খামারে একটি বাছুর বাঁধা। চারিদিকের অনিশ্চয়তা আর দুর্ভাবনার মাঝখানে ওই দরিদ্র পর্ণকুটীরখানি যেন আশ্বাস এবং নিরাপত্তার প্রতীক্। ওখানে দেখছিনে কাউকে; হয়ত বা 'বাহে'-র ঘর। কিংবা জংলী,—জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে একই সঙ্গে ঘরকন্না পেতে বসেছে। কিন্তু মানুষ থাকে ওখানে, আমাদের কাছে সেই হোলো ওর মূল্য।

স্থির করা গেল চারজন আমরা যাবো গাড়ী নিয়ে সরস্বতীপুরের দিকে, বাকি তিন জন এখানে অপেক্ষা করবে। ঠিক মনে নেই, আন্দাজ মাইল দেড়েক হতে পারে। বেলা চারটে বেজে গেছে।

অনেক দূর গিয়ে পিছন পথে কান পেতে শুনেছিলুম, ছেলেরা সহসা চীৎকার করতে শুরু করেছে। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে যখন থমকে দাঁড়ালুম তখন মাষ্টার মশাই হাসিমুখে বললেন, ভয় নেই, ওরা গান ধরেছে! ভয় পাচ্ছে কিনা—

সরস্বতীপুর হোলো মস্ত বড় চা-বাগান। শিকারপুর অপেক্ষা এর উৎপাদন ক্ষমতা বেশী। এর মালিক অশ্রুমতী নন্, ভিন্ন লোক। শ্রমিকের সংখ্যা এখানে প্রচুর, এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিরাটতর। যখন গিয়ে পৌঁছলুম সেখানে, তখন শ্রমিক নরনারীদের মধ্যে রেশন্ ও বেতনাদি বিতরণ করা হচ্ছে।

ম্যানেজার মশাই অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে এলেন। কোনো বাইরের লোক এলেই এঁরা খুশী হন্, কেননা চা-বাগানের লোক বৃহত্তর সমাজ থেকে সর্বদা নির্বাসিত থাকে। ম্যানেজার মশাইয়ের চেহারা যেমন বিরাট, তেমন স্থূলকায় ও কৃষ্ণাঙ্গ। চোখ দুটো সর্বদা পাকানো এবং রক্তিমাভ। প্রথমটা একটু থতিয়ে গিয়েছিলুম। একথা বিশ্বাস করি, অন্ধকার রাত্রে তিনি যদি কোনো গৃহস্থের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ান্, তাহলে পুরুষরা পালাবে, এমন কি মেয়েদের দাঁতি লেগে যাবে।

ছি, এসব কথা আমার বলা উচিত হচ্ছে না!

অল্পক্ষণ মাত্র, তাপরেই আমার ভুল ভাঙলো। নত নমস্কার ক'রে এমন বন্ধুর মতো হাসলেন তিনি যে, তখনই আমার মনে হোলো এ ব্যক্তি পরমাত্মীয়। আমার পরিচয় দিলেন মাষ্টার মশাই, আমি নাকি লেখক।

লেখক! কোন্ বাগানের?···তাঁর ঘোরালো কণ্ঠস্বরে মাষ্টার মশাই একটু থতমত খেলেন। বুঝতে পারা গেল, চা-বাগান ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো বিষয় বস্তুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। যাই হোক, আমাদের জন্য তৎক্ষণাৎ তিনি জলযোগ ও চা-পানের ব্যবস্থা করলেন।

পেট্রল সংগ্রহ করতে সময় লাগলো। পাহাড়ে আর জঙ্গলে অথবা

কোনো তুস্তর পথে এ প্রকাশ, সৌজন্যের রীতি চালু আছে যে, একজনের মোটর গাড়ী অচল হ'লে অন্যজনে···সে যতই অপরিচিত হোক···পথের মাঝখনে সাহায্য করে। শিকারপুর অর সরস্বতীপুর···উভয়ের মধ্যে হয়ত ব্যবসায়াগত রেষারেষি আছে, থাকাও সম্ভব—কিন্তু আমরা শিকারপুরের অতিথি একথা জানার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারবাবু বিনা মূল্যে পেট্রল দিলেন।

প্রায় সন্ধ্যা হ'তে চললো, প্রান্তরের দিগন্ত অস্পষ্ট হয়ে আসছে। আমরা পেট্রল নিয়ে আবার যাত্রা করলুম। আমাদের দেরি দেখে তিনটি ছাত্র হাঁটতে হাঁটতে এত দূরে এসেছে। তা'রা ধৈর্য ধ'রে আর স্থির থাকতে পারেনি।

আলোর কথা ওঠে না, তা'র চিহ্নমাত্রও নেই। যদি অন্ধকারের আগে আমাদের গাড়ী ছুটতে পারতো, মাষ্টার মশাই খুশী হতেন। কিন্তু তা হবার নয়। পথটা হোলো সম্পূর্ণই কাঁচা। মাটির মধ্যে মাঝে মাঝে চাকা ব'সে যাচ্ছে। সুতরাং গাড়ীর গতি বাড়ানো চলছে না। তাছাড়া নালী আছে পাশে। মাঝে মাঝে আছে পথের শাখা প্রশাখা, পথ হারাবার ভয় ছিল। অরণ্যের মধ্যে পথ হারালে আজ রাত্রে ফিরবার কোনো আশা নেই। এক সময় গাড়ীর হেড লাইট্ জ্বালতে হোলো। মাষ্টার মশাই অত্যন্ত ব্যাকুল চক্ষে সামনের পথটাদ প্রতি চেয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে আলোকিত পথটুকুর বাইরে আর কিছু দেখা যায় না।

একটি ঘটনা ঘটলো যেটির সঙ্গে আগে আমার পরিচয় ছিল না, এবং মোটর গাড়ী ব্যবহারের ব্যাপারে আমার মনে একটা চিরস্থায়ী আতঙ্কের ছাপ রেখে গেল। আমি কেবল ভাবি পাহাড়ের পথ হ'লে আমাদের নিশ্চিত অপমৃত্যু ঘটতো। মোটরখানা কিছুক্ষণ ধ'রে চলতে চলতে সহসা এক সময়ে আপন খেয়ালে এদিক ওদিক ঘুরতে আরম্ভ ক'রে দিল। মধ্যরাতে কলকাতার পথে কোনো কোনো মাতাল যেমন এধার থেকে ওধারে ছিটকোয় এবং এপাশে ওপাশে পড়তে পড়তে যেমন টাল সামলায়, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের গাড়ীটি তলার দিক থেকে প্রবল ঝাঁকুনির সঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ড্রাইভার প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি, এবং কিছু বুঝতে পারার চেষ্টা করতে করতেই এক সময় সামনের তুখানা অবাধ্য চাকা পথের মাটির স্তূপের

মধ্যে একেবারে পুঁতে গেল। গাড়ী আটকে গিয়ে থেমে গেল ব'লেই আমরা অক্ষত রইলুম।

স্তব্ধ অন্ধকার অরণ্য! আমরা বাকশক্তিরহিত। দেশালই জ্বেলে দেখলুম, সাতটা তখনও বাজেনি। নীচে অন্ধকার, উপরে আকাশের ফালিতে তখনও আলোর আভাস আছে। সবাই মিলে প্রায় সাত মাইল হেঁটে শিকারপুরে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। মাষ্টার মশাই বললেন, আমি আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসিনি!—ছাত্রবন্ধুরা অনেকটা বিমূঢ়।

ড্রাইভার নামলো। তারপর গাড়ীর নীচের থেকে কয়েকজন মিলে মাটিরস্তূপ সরাতে লাগলো। টর্চ আনবার কথা কারো মনে হয়নি, অন্ধকারেই কাজ চললো। দূরের থেকে সাড়া পাওয়া গেল, কয়েকজ শ্রমিক আসছে তাদের মাষ্টার মশাই মজুরি কবুল করলেন। তা'রা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কিছু মাটি সরিয়ে গাড়ীখানা একটু ঠেলে দিয়ে কিছু পয়সা নিয়ে চ'লে গেল। ড্রাইভার এবার গাড়ীর নীচের বুকের উপর ভর দিয়ে সরীসৃপের মতো ঢুকলো, এবং একটু পরে জানালো, 'টাই-রড্' খুলে গেছে!

মোটরের মধ্যে নানা যন্ত্রপাতির সঙ্গে 'টাই-রড্' নামক বস্তুটি জীবনমৃত্যুর নির্দেশ করে—এ সংবাদটি এমন ভাবে আগে জানা ছিল না।

সেদিন সাড়ে আটটায় গিয়ে পৌঁছেছিলুন শিকারপুরে। সেখানে আমাদের নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মাষ্টার মশাই পনেরো মিনিটের বেশী সময় দিতে প্রস্তুত নন্। তাঁর ধারণা কোনোমতে জলপাইগুড়িতে পৌঁছতে পারলে সভায় যাওয়া যাবে। শ্রোতারা প্রচুর ধৈর্যশীল। অতএব কোনোমতে কিছু গলাধঃকরণ ক'রে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লুম। এবারে পথ সামান্য। পাঁচ ছয় মাইল যেতে পারলেই বেল্লাকোপা। সেখান থেকে পাকা রাস্তা ধ'রে বায়ুবেগে জলপাইগুড়ি। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ী যাবে।

বেল্লাকোপায় ঠিক পৌঁছইনি, তবে কাছাকাছি এসেছি—এমন সময় সহসা ঝুপসি অন্ধকার পথে গাড়ী থামলো। ড্রাইভার বাঁ হাতের কাছে ডাঁটিটা টানাটানি করে, একবার চাবি ঘোরায়, ষ্টিয়ারিং বাঁকায়, বাঁ পায়ে কি যেন টেপে—কিন্তু গাড়ী আর চলে না। তারপর সে নেমে গেল এবং

মেসিনের ঢাকা খুলে কি যেন পরীক্ষা ক'রে এসে বললে, গাড়ী আর যাবে না !

মিনিট ছুই আগে একখানা ট্রেন চ'লে গেল জলপাইগুড়ির দিকে। আমাদের সাহস ছিল এই, অদূরবর্তী একটি গ্রাম্য দোকানে টিপ টিপ ক'রে একটি আলো জ্বলছে। তাছাড়া সবই নিঃঝুম অন্ধকার।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার মতো আর কেউ এমন কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করছে না। হাসি চেপে আছি প্রথম থেকে। ঘড়ির সঙ্গে এরা পাল্লা দিচ্ছে, অবস্থার সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করছে। নিয়তির ক্রীড়নক। ওরা পাচ্ছে লজ্জা, আমি পাচ্ছি আনন্দ। ওদের ক্লান্ত শরীরের ওপর এই ভাগ্য বিপর্যয় ওদেরকে যখন অবসন্ন ক'রে আনলো, আমি পেলুম নতুন ধরণের উদ্দীপনা। গাড়ীর মধ্যে রাত্রিবাস করবে তুজন, আর বাদ বাকিরা যাবে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে। গাড়ীর মধ্যে আমি থাকবো—থাকবে এই বনের ধার আর এই আঁধার রাত্রি। সেদিন বড় উৎসাহ বোধ করেছিলুম।

কিন্তু আমার কপালও মন্দ। আন্দাজ ঘণ্টাখানেক পরে স্টেশনের দিকটায় একটা হট্টগোল শোনা গেল। একখানা জীপগাড়ী এসেছে এই দিকে। তা'রা কয়েকজন লোককে ডেকে নানা প্রশ্ন করছে। ক্রমশঃ জানা গেল গাড়ীখানা এসেছে আমাদের খুঁজতে। জলপাইগুড়ির শ্রদ্ধেয় নেতা ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে গাড়ী পাঠিয়েছেন। আনন্দে ও উল্লাসে মাষ্টার মশাই কেবল কাঁদতে বাকি রাখলেন!

ডাঃ চারুচন্দ্রের উদ্দেশে সকলেই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানালো,—শুধু আমি ছাড়া! একটি অভিনব অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্র থেকে তিনি আমাকে আজ রাত্রে বঞ্চিত করলেন! এ ক্ষতি তাঁকে বোঝানো কঠিন।

জীপগাড়ী বায়ুবেগে চললো প্রান্তর পেরিয়ে জলপাইগুড়ির দিকে। যখন গিয়ে পৌঁছলুম, শহর তখন ঘুমিয়ে। সভাসমিতির কথা আর ওঠে না। বাঁচলুম।

কোচবিহার বিমান-ঘাঁটিতে গিয়ে নামলে প্রথমেই চোখ পড়ে সুদূর উত্তর-পশ্চিমে। চমলহরির পাশে চেন-চুর তুষারাবৃত পর্বতমালা। যতদূর দৃষ্টি যায় অন্তহীন সবুজ প্রান্তর, এবং তারপর টিরাই অঞ্চলের সীমানা। মাঝখান

দিয়ে চ'লে গেছে রেলপথ—কোচবিহার থেকে আলীপুরদুয়ারের দিকে সেখান থেকে রাজাভাতখাওয়া আর কালচিনি হয়ে সোজা দলশিং পাড়া। ওর মধ্যে আবার রাজাভাতখাওয়া থেকে রেলপথ বেঁকেছে ডানদিকে—জয়ন্তীর গভীর অরণ্যে গিয়ে সে-পথ শেষ হয়েছে।

আমি যাচ্ছিলুম আলীপুরদুয়ারে। তরুণ বন্ধুরা এসেছিল বিমান-ঘাঁটিতে, তাদের সঙ্গে ছিল একখানা জীপগাড়ী। রেলপথে না গিয়ে আমরা যাবো প্রান্তরের ভিতর দিয়ে মাইল-চব্বিশেক পেরিয়ে। সেটা বড়দিনের পূর্বাহ্ণ।

কোচবিহার থেকে যাব দক্ষিণে, উত্তর অঞ্চল হোলো—জলপাইগুড়ি। দার্জিলিং জেলাকে বাদ দিলে সমগ্র উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ির মতো এমন রোমাঞ্চকর রহস্যরাজ্য আর দ্বিতীয় নেই। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের থেকে এই অঞ্চল চিরদিনই একটা বিচ্ছিন্ন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—যার সত্য ও আনুপূর্বিক চেহারাটা আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয়ত, অবিভক্ত বাঙ্গলায় পূর্বোত্তর বঙ্গের সঙ্গেই জলপাইগুড়ির যোগাযোগ ছিল বেশী; আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার সর্বপ্রকার খোঁজখবর রাখার বিশেষ প্রয়োজন আমরা বোধ করতুম না। আজ বিভক্তবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে দাঁড়িয়ে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, জলপাইগুড়ির বহু অঞ্চল আজ অনাবিষ্কৃত।

আমাদের জীপগাড়ী যাচ্ছিলো প্রান্তরের ভিতর দিয়ে শীতের রৌদ্রে। মধ্যাহ্ন কাল, কিন্তু শীতের বাতাস স্নিগ্ধ মধুর লাগছিল। বায়ুবেগে চলেছে জীপগাড়ী, আমাদের পথ হোলো সোজা উত্তর দিকে। রেলপথের প্রায় পাশে-পাশেই যাচ্ছি ধানকাটার মাঠের ধার বেয়ে। পশ্চিম দুয়ার এবং পূর্ব দুয়ারের প্রায় মধ্যবর্তী,—এবং দুই দুয়ারের অধিকাংশ উত্তরভাগ মিলেছে নিষিদ্ধ রাজ্য ভূটানের সীমানায়। নিষিদ্ধ সন্দেহ নেই, কারণ শত-শত বছর ধ'রে ভুটানকে সমগ্র ভারতের থেকে এমনভাবে নির্লিপ্ত ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছে যে উভয়ের মধ্যে এতকালের ইতিহাসে স্পষ্ট কোনো আত্মিক, রাজনীতিক অথবা সামাজিক যোগাযোগের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঠিক মনে নেই, শেষের দিককার মাইল আষ্টেক-দশ এতই ধূলিময় যে, আমাদের চেহারা গেল বদলে,—আপাদমস্তক ধুলোয় ধুলো! কিন্তু এই

অজানা পথের এমন আশ্চর্য আকর্ষণ ছিল যে, আনন্দের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি। এই কাঁচাপথ গিয়ে শেষ হোলো কালজানি নদীর সীমানায়। নদীটি শীতের দিনে শীর্ণকায়, কিন্তু বর্ষায় বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে ওঠে। সমস্ত জলটা নামে হিমালয়-রাজ্য ভূটান থেকে। মত্ত মাতঙ্গের মতো সেই জল এবং সেই সাংঘাতিক জলস্রোতে সত্যসত্যই মাতঙ্গ পর্যন্ত ভেসে যেতে থাকে। অপরাহ্নকালে এসে আমরা নদীর ধারে নেমে গাড়ীসুদ্ধ ভেলায় পার হলুম। পাশ দিয়ে রেলের একটা সাঁকো আছে বটে, কিন্তু বর্ষার বন্যাকালে তার কি প্রকার অবস্থা দাঁড়ায় সেটা অনুমান করতে পারি। নদী পার হয়ে আমরা আলীপুরদুয়ার শহরে এসে প্রবেশ করলুম। মহকুমা শহর, কিন্তু আবহাওয়াটা পল্লীপ্রধান। শহরের উপকরণ আছে কিছু কিছু, কিন্তু আগাগোড়া গ্রাম। পাকা রাস্তার চিহ্ন আছে একটু-আধটু, কিন্তু কবে পাকা ছিল তার সন-তারিখ খুঁজতে হয় ইতিহাসে। প্রথমেই ধারণা হয়, একটা বৃহৎ জগৎসংসার থেকে এ-রাজ্যটা একেবারেই বিচ্ছিন্ন। পূর্ব-পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকে এসব অঞ্চল আমাদের পক্ষে দুর্গম হয়ে পড়েছে। পথের আশে-পাশে কাঁচা বাড়ী, আটচালা, গোলপাতার ঘর, করোগেটের চালা। অবস্থা যাদের কিছু স্বচ্ছল তাদের বাড়ী হোলো কাঠের, এবং পোঁতার ওপর সে-বাড়ী তৈরী, উপরের ঢাকা হোলো—করোগেটের। বাড়ীর তলা দিয়ে বন্যার প্রবাহ চ'লে যাক্, বাঘ ভাল্লুক এসে তলায় লুকিয়ে থাকুক,—এবং থাকতোও,—কিন্তু বাসিন্দাদের কিছু তাতে এসে যায় না। কাঠের প্লাটফর্মটাই হোলো ঘরের মেঝে। ঘরে ও বারান্দায় যদি কেউ গুরুপদক্ষেপে আনাগোনা করে তবে সমস্ত বাড়ী কাঁপতে থাকে। জঙ্গলের জন্তু যদি বাড়ীর তলা দিয়ে এসে উঠোনে ঘুরে যায়, বলবার কিছুই নেই, এমনিই অবারিত দ্বার! গৃহস্থ ঘুমিয়ে রইলো ঘরের মেঝেতে, কিন্তু তার পিঠের তলা দিয়ে হয়তো 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' আনাগোনা ক'রে গেল,—গৃহস্থ জানতেও পারলো না। কলিকাতা-বাসীদের পক্ষে একটু বৈচিত্র্য বৈ কি। নদীর মাছ, জলের জন্তু, বড় বড় সাপ ও সরীসৃপ,—এরা ভাসতে ভাসতে এসেছে প্লাটফর্ম-তোলা বাড়ীর অন্দরমহলে,—এসব গল্প শুনে অবিশ্বাস করার যুক্তি নেই। সুতরাং এখানে আমার অভিজ্ঞতাটা কিছু নতুন ধরনের। সমগ্র আলীপুরদুয়ার শহরে

একমাত্র কাছারিবাড়ীটি ছাড়া আর কোনো বাড়ী আজও পাকা হয়নি। এতকাল ধ'রে এইটিই সরকারী নির্দেশে চ'লে আসছে।

আমি যাঁর বাড়ীতে আতিথ্য নিলুম তাঁর নাম শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বিশ্বাস। তিনি স্থানীয় কংগ্রেসের সেক্রেটারী, এবং এখানকারই একটি সিনেমা-হলের মালিক। এমন অমায়িক, নিরভিমান এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি ওখানে খুব কমই আছেন। আমার বিশ্বাস, তিনি সজ্জন ও সাধু ব্যক্তি ব'লেই কংগ্রেস ওখানে জনপ্রিয়! অতিথির স্বাচ্ছন্দ্যসৃষ্টির জন্য এমন নিখুঁৎ পরিবেশ তিনি ক'রে রেখেছিলেন যে, আমি অভিভূত হয়েছিলুম। আমি গিয়েছিলুম ওখানকার বাৎসরিক সংস্কৃতি-সম্মেলনে। কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল—ভ্রমণ। ওটাই আমার কাছে মুখ্য।

প্রকৃতির অবাধ স্বেচ্ছাচার এমন অব্যাহতভাবে আলীপুরদুয়ার ছাড়া, আমার বিশ্বাস, আর কোথাও চলে না। বন্যা এসে আঘাত করে সামনে এবং পিছনে বছর-বছর—তাকে বাধা দেবার উপাই নেই। শহরের ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দেবে মানুষের আবাস-গুলিকে যখন, তখন সে ছিন্নভিন্ন করবে,—বলবার কিছু নেই। অরণ্যচারী জন্তু-জানোয়ারেরা যখন-তখন হানা দেবে শহরের মাঝখানে,—মানুষ মরবে, গরু-ছাগল টেনে নিয়ে যাবে, আতঙ্কের সঞ্চার করবে,—কিন্তু শিকারী ছাড়া তাদেরকে বাধা দিচ্ছে কে? ফলে জল জঙ্গল এবং জানোয়ার—এদের করুণার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে নিরুপায় হয়ে ব'সে রয়েছে আলীপুরদুয়ার। আমি যখন গিয়ে দাঁড়ালুম তার কয়েক-মাস আগে কালজানি নদীর বিভিন্ন ধারায় বন্যা এসে এই ক্ষুদ্র শহরটিকে খানখান ক'রে কেটেছে। এর কোনো প্রতিকার আছে কিনা কেউ বলে না।

বনজঙ্গল হোলো আলীপুরের প্রধান অঙ্গ। এটা পাহাড়-তলীর প্রান্তভাগ সন্দেহ নেই। ভূটানের পাহাড় থেকে নেমে আসে ঢল, অরণ্যের নালী বেয়ে আসে বর্ষার ধোয়াট,—সুতরাং জলধারার গতিপথ সকল সময়েই খুলে রাখতে হয়। ছোট বড় মাঝারি স্রোতস্বিনী ছাড়াও চারটি প্রধান নদী নেমে এসেছে হিমালয় থেকে। সেই চারটির নাম হোলো কালজানি, গদাধর, ধরালা এবং কালচিনি তথা রায়ডাক। এর মধ্যে কালজানি নদীটি আলীপুরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে তার গতি। দু-ধারের প্রান্তর উর্বর, কিন্তু বনময়।

এই নদীর দুরন্তপনা থেকে আলীপুরকে রক্ষা করার জন্য স্থানীয় লোকের চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু ওই চেষ্টার সঙ্গেই জড়ানো থাকে নৈরাশ্য,—কেননা নদীর দুরন্ত বেগ মানুষের সকল চেষ্টার উপর প্রভুত্ব করতে থাকে। সুতরাং জলের সঙ্গে মানুষের নিত্য দ্বন্দ্ব এখানে লেগে রয়েছে। এই কালজানি নদীর সীমানা অঞ্চলকে এড়িয়ে আলীপুর জংশন ষ্টেশনটি নির্মাণ করা হয়েছে উচ্চভূমিতে। এই রেলপথটি চ'লে গেছে রাজাভাত-খাওয়ার দিকে। সেখান থেকে আবার এই পথটি দুইদিকে প্রসারিত। একটি গিয়ে শেষ হোলো জয়ন্তীর অরণ্যে, অন্যটি দলশিংপাড়া।

সুধীর বিশ্বাস মহাশয়ের ওখানে আতিথ্য জোটে প্রত্যেকেরই—যাঁরা আলীপুরে যান্! বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, অগ্র ও পশ্চাৎপন্থী—সকলেই সমাদরের সঙ্গে আশ্রয়লাভ করেন। আলীপুরদুয়ার অপেক্ষা তাঁর দুয়ার অধিকতরো অবারিত। কিছুদিন আগেই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ গিয়ে উঠেছিলেন ঠিক এই ঘরটিতে, সমাজতন্ত্রী ডাঃ নীহার রায়ও এই একই ঘরে। এই সম্প্রতি কয়েকদিনের মধ্যেই আসছেন কলকাতা কংগ্রেসের কোনো কোনো কর্তা। আমি নিজে উর্ধ্বপন্থী কিংবা অধোপন্থী তা জানিনে। তবে দূরপন্থী নিশ্চয়ই।

আমার এই দূরগামী মনের যে দু-একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গী পাওয়া গেল, তাঁদের একজন হলেন মনীষী রায়। তিনি এই অঞ্চলেরই অন্তর্গত 'মাঝের দাবড়ি' চা-বাগানের ম্যানেজারও বটেন এবং মালিকের অন্যতমও বটেন। এককালে তিনি ছিলেন বিপ্লবী রাজনীতিক কর্মী, এবং বাংলার বহু জীবিত ও মৃত নেতাগণের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে জড়িত। বাক্যরসিক, হাস্য-রসিক এবং সাহিত্য রসিক,—এই তিন রসের তিনি ত্রিধারা সঙ্গম। বাঙ্গালার তিন-পুরুষকে তিনি চেনেন ব'লেই তাঁর নাম দিয়ে এসেছি ত্রিযুগী নারায়ণ। আলীপুর দুয়ারের সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত। তিনি তাঁর মস্ত নতুন মোটরখানি নিয়ে সুধীরবাবুর বাড়ীতে হাজির রইলেন।

বাঙ্গালী বড় অদ্ভুত জাতি। কোনো দুর্গতিতে কোনো মতেই তার মৃত্যু হয় না। ফারসী-ওলন্দাজ-পর্তুগীজ-মারাঠা—এদের হাতে মার খেয়ে একদিন বাঙ্গালীর পাঁজরা ভেঙে গিয়েছিল। তার আগে এসে মেরেছে কত জাতি—

পাঠান মোগল মগ ইংরেজ,—এদের হাতে মার খেতে খেতে বাঙ্গালা একেবারে ধূল-ধাবাড়ি! বাঙ্গালী ম'রে ভূত হয়, ভূত ম'রে প্রেত হয়, প্রেত ম'রে আবার বাঙ্গালী হয়। এখানে এসে দেখি আশ্চর্য, বাঙ্গালী বেঁচে রয়েছে! এত দুর্গতির মধ্যেও তারা আয়োজন করেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। একটু গানের মজলিস, একটু নাচের আসর, একটু কাব্য-সাহিত্যের মিষ্ট মধুর আলাপ। অনেক দরকারি কাজ ফেলে এসেছে যে যার বাড়ীতে, ছেড়ে এসেছে গৃহকর্মের দায়িত্ব আর মুখ-চাওয়া,—কেননা এখানে প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য বিড়ম্বনার বাইরে আনন্দের হাট বসেছে। তিরিশ বছর আগে সমস্ত ভারতে একমাত্র বাঙ্গালীরাই সর্বত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে বেড়াতো,—পেশওয়ার থেকে বর্মা, এবং কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা। আজ বাঙ্গালীর এই অনুষ্ঠানকে নকল করে সবাই। মাদ্রাজীরা বসায় নাচগানের আসর কলকাতায়, বিহারীরা বসায় সাহিত্যের আসর পুরুলিয়ায়। রাজস্থানী, গুজরাটি, মারাঠি, উত্তরপ্রদেশী,—সবাই এসেছে এগিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে তারা 'মৌলিক' হবার বাসনায় বাঙ্গালীকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রে যায়, পাছে অনুকরণটা ধরা পড়ে। আমরা মনে মনে হাসি। হেসেছি আমরা অনেকেই সাহিত্য ও ললিতকলা সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ্য ক'রে।

সুধীরবাবুর এই বাড়ীটি হোলো পলাশবাড়ী অঞ্চলে। বাবুপাড়া বলে কোন্‌টাকে, আমার ঠিক মনে নেই। তবে সুধীরবাবুর বাড়ীর প্রায় কাছে দিয়েই চলেছে কালজানি নদী,—প্রায় তিনি তটস্থ। মনীষী রায় মহাশয় এখান থেকেই তাঁর মোটরে আমাদের কয়েকজনকে তুলে নিয়ে গেলেন। সমগ্র আলীপুরদুয়ার মহকুমাটি তাঁর নখদর্পণে। আমাদের মোটর চললো উত্তর পথে।

ছোট্ট শহর আশেপাশে। কাজ কারবার বলতে হয়তো কিছু আছে, কিন্তু চোখে পড়ে না। ইস্কুল-পাঠশালা দেখেছি বৈ কি; কোর্টকাছারির কাজকর্মও আছে। তবু জলপাইগুড়ির প্রধান যে দুটো কারবার—এখানেও তা রয়েছে। অর্থাৎ চা-বাগান এবং জঙ্গলের কাঠ ও গাছের গুঁড়ি চালানের কাজ। এ কাজ মস্ত বড়, অথচ উৎপাদনের খরচ কিছু নেই। দুটো কাজই

আমি নানা জায়গায় অনেকবার দেখে বেড়িয়েছি। প্রথমটা দেখলে আনন্দ পাই. দ্বিতীয়টা কিন্তু খুবই রোমাঞ্চকর। আমরা শহরের এখানে-ওখানে নানা পল্লীর ভিতর দিয়ে একটু বাইরের দিকে এলুম। সম্প্রতি কিছু কিছু রেফুজী এ-অঞ্চলে এসে জায়গা নিয়েছে। বছর-তিনেক আগেও নাকি এইসব গ্রামের প্রান্তে সন্ধ্যার পরে কেউ ঘরের বাইরে আসতো না, বাঘের ভয় ছিল বেশী। জন্তুরা নাকি একসময়ে দল বেঁধে হানা দিতো। বন্য হাতীরা এসে লুট-পাট ক'রে নিয়ে যেতো, ক্ষেতখামারে হরিণ, আর বন্যশূকরেরা এসে রাত্রের দিকে রাজ্যপাট বসাতো। এখন বাঘ আসে না অনেক ক্ষেত্রে, তবে অন্য জন্তুরা প্রায় নিত্যই আনাগোনা করে।

কাছারির পল্লীতে আজ লোকজন কম। বড়দিনের বাজার। ছুটির দিন। এখানে একমাত্র পাকাবাড়ী হোলো কোর্টবিল্ডিং। পাকাবাড়ী তৈরী এখানে আজও নিষিদ্ধ। আশে-পাশে উকীল মোক্তারদের পাড়া। এদিক-কার পথ-ঘাট কিছু প্রশস্ত। কাছারির লাইনটা ডানদিকে রেখে আমাদের গাড়ী চললো দমনপুরের দিকে। পাশে পাশে চলেছে রেলপথ। মাইল চারেক এসে ডানদিকে সরু পথ চলে গেছে 'মাছের দাবড়ি'-র চা-বাগানের দিকে। এদিকে রেল কোম্পানীর অনেকগুলি সুন্দর বাগান-ঘেরা বাংলা দেখতে পাওয়া যায়। আলীপুর জংশনের দিকে এলে তবে এই মহকুমার প্রকৃত চেহারাটা বুঝবার পক্ষে সহজ হয়।

অরণ্য সীমানার কাছেই হোলো 'মাঝের দাবড়ি' চা-বাগানের কেন্দ্র। মনীষীবাবু এখানে থাকেন। প্রশস্ত সুন্দর বাগান বাড়ী,—চারিদিকে এত তার নিখুঁৎ বিধি ব্যবস্থা এবং বিলাস-বৈভবের আয়োজন যে, একটু অবাক লাগে। সামনের দিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, এবং তারই মধ্যে একটি অতিথি-শালা! এমন তার সুবন্দোবস্ত যে, বাকি জীবন সপরিবারে এখানে দিব্য কাটানো চলে। পিছনে এবং পাশে অরণ্যের সীমানা। অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া দিনের বেলাতেও সেদিকে অগ্রসর হওয়া নিষিদ্ধ। তরাই অঞ্চলের এই অরণ্য হিমালয়ের পাহাড়তলী দিয়ে এসেছে শত শত মাইল, এবং এখান থেকে চ'লে গেছে উত্তর আসামের পথে। তারপর হিমালয়ের কোলে কোলে দেওয়ানগিরি এবং উদালগুঁড়ি হয়ে সোজা রাঙ্গাপাড়া আর বালিপাড়া

ট্র্যাকের দিকে,—যেদিকটায় গণ্ডারদের জন্য সংরক্ষিত অরণ্যলোক। কিন্তু উদালগুঁড়ির অরণ্য ছাড়ালে ভূটানের সীমানা শেষ হয়, এবং তারপর বনময় নদী পার হয়ে গেলেই রাঙ্গাপাড়ার সীমানা। তখন আসাম অরণ্যের দুস্তর দুর্গম পাহাড়তলার চেহারাটা বুঝতে পারা যায়।

মনীষী রায়ের ওখানে জলযোগ সেরে এবং বৈঠকখানায় মরা জন্তুর যাদুঘর দেখে আমরা দমনপুরের দিকে চললুম। প্রথমেই চোখে পড়ে কাঠ ও গাছের গুঁড়ির আড়াৎ। একটি দুটি নয়, অনেকগুলি। এখানকার ঠিকাদাররা অরণ্যের ভিতর এক একটি অঞ্চলে গাছকাটার অনুমতি পায় টাকার বিনিময়ে, —সেই টাকা পায় প্রাদেশিক সরকার। এরা আবার সেই কাঠ থেকে শ্লিপার তৈরী ক'রে রেল কোম্পানীকে বিক্রি করে। সর্বত্রই ভারত গভর্ণমেণ্ট হোলো প্রধান খরিদ্দার। এই কারখানা ছাড়ালেই মোটামুটি অরণ্যপথ। দমনপুরকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে তরাই অঞ্চলের বিশাল দুর্ভেদ্য অরণ্য। সেই অরণ্য ও পাহাড়তলীর ভিতর দিয়ে গেছে রেলপথ। রাত্রের দিকে ট্রেন বিশেষ চলে না, কারণ তার প্রয়োজন ঘটে না। আমরা চললুম উত্তর পথে রাজাভাতখাওয়ার দিকে। পূর্ব দুয়ার এবং পশ্চিম দুয়ারের মাঝামাঝি পথ ধরেই আমাদের গাড়ী চললো হু হু গতিতে। এবার আমাদের শীত ধরেছে। বনজঙ্গলের মধ্যে ঠাণ্ডা জমাট বেঁধে থাকে। যতটা ঠাণ্ডা বাইরের দিকে, তার চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা জঙ্গলে। কিন্তু পথ আমাদের বড় আনন্দময়। মধুর রৌদ্রে, স্নিগ্ধ বাতাসে, নীল আকাশে, সবুজ পাহাড়ে এবং ঘন শালের জঙ্গলে মিলে আমাদের এই ভ্রমণ অতি উপাদেয়। এর সঙ্গে রয়েছে মনীষী রায় মহাশয়ের সরল আলাপের চাটনি! হাস্যে ও পরিহাসে সমস্ত পথটাকে যেন কুসুমাস্তীর্ণ মনে হচ্ছিলো।

দুইদিকে বিশাল শালপ্রাংশু,—নিজেদেরকে বড় ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। এক-একটি নিভৃত নালীপথে কুলকুলিয়ে চলেছে কোনো অদৃশ্য ঝরণার ধারা। এগুলি জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনার পথ। একা-একা এ-অঞ্চলে কেউ আসে না কচিৎ কখনো এক-আধজন শ্রমিককে দেখা যায়, লাঠি বা লৌহাস্ত্র নিয়ে সাবধানে পেরিয়ে চলেছে। কাঠ চেরাইয়ের কারখানা কোথাও

কাছাকাছি থাকলে দু-চারজন লোককে এখানে দেখা যায় মাত্র। তারপর নিঃঝুম অন্ধকার অরণ্য : আমাদের গাড়ীতে বন্দুক আছে সব সময়ে।

রাজাভাতখাওয়া এলো। এটি-একটি স্টেশন। এখান থেকে গিয়েছে গারোপাড়া ও কালচিনির পথ। তারপর দলশিংপাড়া। এদিকে বক্সারোড হয়ে জয়ন্তীর অরণ্য-স্টেশন। আমাদের গাড়ী ফিরলো ডানদিকে জয়ন্তীর পথে। যারা আসেনি তারা বুঝতে পারবে না, এই অঞ্চলের ঘন জঙ্গলের দুর্ভেদ্যতা। মাঝে মাঝে পথ চ'লে গেছে এপাশে-ওপাশে, কিন্তু সেই নির্জন বনপথের দিকে তাকালে দিনের বেলাতেও গা যেন ছম্‌ছমিয়ে আসে। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষ সমস্ত ভয় ও দুর্ভাবনাকে জয় করতে চেয়েছে। দূর থেকে পর্বতের দুর্গম চেহারা দেখলে মনে হয়, মানুষ ওখানে থাকে না; দুর্ভেদ্য বনলোক দেখলে সবাই বলবে, মানুষের বসবাস এখানে অসাধ্য,—কিন্তু অনেক সময়েই সে-ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আট থেকে দশ হাজার ফুট পর্যন্ত পাহাড়ীরা বাস করছে অনায়াসে, কঠিন পরিশ্রম আর অধ্যবসায় নিয়ে তারা আপন আপন অন্নসংস্থান করছে। সেই তাদের জীবন, সেই তাদের বিধি-নির্দেশ। অরণ্যেও ঠিক তাই। জানোয়ার ও সরীসৃপের সঙ্গে সেই গহন অরণ্যলোকে মানুষের নিত্য সংগ্রাম চলছে। ওরই মধ্যে তারা গরু চরায়, ঘর বাঁধে, ধান বোনে, শিশুপালন করে। বন্যার তাড়নায়, বাঘের দাঁতে, সাপের ছোবলে, ভালুকের নখে, হাতীর পায়ের তলায় এবং মহামারীর কবলে,—প্রাণ দিচ্ছে তারা যুগে যুগে; কিন্তু মার খেয়ে তারা আবার উঠছে ওই মাটি ধ'রে, আবার গাইছে জীবনের জয়গান, আবার তাদের চোখে সুন্দর প্রাচীন পৃথিবী হেসে উঠছে!

এখানে হাতীর ভয়। হাতী হোলো খেয়ালী। যদি বিরক্ত করো তবে তারা প্রতিশোধ নেবে। যদি কিছু না করো তবে তারা আপন খেয়ালে গাছপালা ভেঙে হয়তো বা দু-একটা বস্তির ঘর দোর মাড়িয়ে আপন মনে দল বেঁধে চ'লে যাবে। এখন হাতী ধরবার কাল আরম্ভ হয়ে গেছে! 'খেদা' বানিয়ে অনেক ঠিকাদার পোষা-হাতী ছেড়েছে। বুনো-হাতীর দলকে টেনে আনবে পোষা-হাতী। কোথাও কোথাও 'রোগ' হাতী এসময় বেরিয়ে আসে। তারা শাসন-বাঁধন মানে না, এবং তাদের হাতে নিরস্ত্র মানুষের

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেই পাগলা হাতীর কবল থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ হোলো, উঁচু পাহাড়ের গা থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়া—অবশ্য যদি সেখানে পাহাড় থাকে। হাতী ঢালু-পথে ছোটে না, পাছে সে নিজের ভারসাম্য রাখতে না পারে। দলপতির ইচ্ছা অনিচ্ছায় হাতী চলাফেরা করে।

জয়ন্তীর স্টেশন পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে আমরা একটি খোলা জায়গায় গাড়ী রাখলুম। এপাশে-ওপাশে পাহাড় আর জঙ্গল। ফরেষ্ট অফিসারের বাংলাটা পেরিয়ে আমরা গেলুম রায়ডাক নদীর দিকে। জনহীন বনপথ। এখানে শিকারীরা ওত পেতে থাকে! দিন-দুপুর নেই, রাত-ভিত নেই,—জন্তুরা এখানে এলেই হোলো। আমরা কোন্ সাহসে এগোচ্ছি তা কিন্তু আমরা জানিনে। কিন্তু সবটাই ভালো লাগছে। পায়ে চলা সরু পথে কিছু দূর গিয়ে আমাদের পথের ওপরেই দেখা গেল, হাতী টাট্‌কা 'নাদ' ফেলে গেছে; এখনও তার থেকে বাষ্প উঠছে। আমরা উৎকর্ণ হলুম। এই কাছেই কোথাও এগিয়েছে! কিন্তু শব্দসাড়া না পেয়ে আবার আমরা অগ্রসর হলুম, এবং নদীর তীরে এসে পৌঁছলুম। এখানকার নাম হোলো ভূটানঘাট। নদীর এপারে ওপারে হিমালয়, কিন্তু ওপারের পাহাড় হোলো ভূটানের মধ্যে। এমন নদী দেখেছি অনেকবার। এর বন্য পার্বত্যপ্রকৃতি আমার জানা অনেককালের! বড় বড় পাথর গড়িয়ে এনেছে স্রোতে,—কাকচক্ষুর মতো নীলাভ জলরাশি। শীতে শীর্ণ, বর্ষায় প্রমত্ত। রায়ডাক পল্লী। বোধকরি এই নদী কিছুদূর গিয়ে নাম নিয়েছে কালচিনি। কিংবা আর কোনো একটা ধারা ঐ নামে এসে মিলেছে নদীর সঙ্গে। এই প্রস্তরসঙ্কুল নদীর পথে অদূরে একটা বিশেষ বাঁকের কাছে কেমন ক'রে হাতীর পাল নেমে আসে ভূটানের পাহাড় থেকে, সেটি আন্দাজ করা গেল। মানুষ সহসা আসে না এ নদীতে, কারণ এদিকে মানুষও নেই, এবং নদীর তীরে কোনো প্রয়োজনও নেই। প্রায় চারদিকেই পাহাড়তলার গভীর জঙ্গল, আর এই বন্য নদী তারই ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। এখানে জন্তুরা এসে জল খেয়ে যায়। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই একটা নির্দিষ্ট টাইম বাঁধা আছে। ভালুক যখন আসে, বনশূয়োর তখন বেরোয় না; বাঘ যখন জল খায়, কাকার তখন

লুকিয়ে থাকে। হাতীর পাল যখন নদীতে আসে, আবার সবাই স'রে দাঁড়ায় জঙ্গলের ভিতরে। ভূটান আর জয়ন্তীর পাখীরা আসে,—তারা সব অচেনা জগতের পাখী। তাদের ডানার রংয়ে লেগে থাকে কত দূর দুর্গমের সংবাদ। কালো কাজলভরা চোখ, সবুজ পাখা, লাল লেজ, হরিদ্রাভ গ্রীবা, মাথায় ঝুঁটি নীলবর্ণের। 'স্নাইপ'রা আসে গলাগলি ক'রে স্নান করতে। রাজহংসের বলাকা উড়ে যায় কালচিনির নীলজলের উপর দিয়ে। সামনের ওই ভূটান নাকি প্রেতপিশাচে ভরা, হয়তো তারাও নেমে আসে রাত্রের দিকে কে জানে!

ভূটানীর সংখ্যা এদিকে কম নয়। অত্যন্ত দরিদ্র, অতিশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাদের বস্তির চেহারা দেখলে কান্না পায়। এমন কালো শ্যাওলা ধরা জরাজীর্ণ কাঠের খুপরির মধ্যে তারা বাস করে যে, মনে হয়, শত শত বছরের মধ্যেও এসব ঘরের সংস্কার হয়নি। না পেয়েছে খাদ্য না বস্ত্র না বা রোগের ওষুধ। সেই দারিদ্র্য দরিদ্র দেশেও কল্পনা করা যায় না। ওরা প্রধানত শ্রমিক কিংবা চাষী। কেউ জঙ্গলে খাটতে কেউবা পাহাড়ের কোলে চাষ করে। দরকার হোলে যে কোনো সময়ে কুকৃরি হাতে নিয়ে বাঘ ভালুকের সঙ্গে তাদের লড়াই বাঁধে, কিন্তু সেইসব ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হয় না। জাতটা যেমনই কঠোর, তেমন অসমসাহসিক। এককালে সমগ্র আলীপুর-দুয়ার ছিল ওদের অধিকারে। সেটা অবিশ্বাস করার কারণও নেই। কিন্তু কালক্রমে রাজনীতিক কারণে কোচবিহারের মহারাজার সঙ্গে ভূটানের মন-কষাকষি হয়। অতঃপর ভূটানের মহারাজার সঙ্গে কোচবিহারের মহা-রাজার যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধের ফলে ভূটান এসে কোচবিহারের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। দুইজন মহারাজা সেই সন্ধিচুক্তিতে যেখানে ব'সে স্বাক্ষর করেন, সেই জায়গাটির নাম হোলো রাজাভাতখাওয়া। এখানে একাসনে ব'সে তাঁরা দু'জনে নাকি ভাত খেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ওই অরণ্যবহুল অঞ্চলে একটি স্টেশনের নাম হয় 'রাজাভাতখাওয়া।'

মনীষী রায় মহাশয়ের চা-বাগান-প্রাসাদে উৎকৃষ্ট মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে আমরা এলুম সামুকতলার পথে। এখানে একটা হাট বসে, সোমবার আর শুক্রবারে। প্রধানত ভূটানী আর জংলী শ্রমিকরাই আসে এই হাটে।

এখানে ঘোড়া, পচাই, শুঁটকি মাছ, লোহার অস্ত্র, জন্তুর হাড়, পাহাড়ী অলঙ্কার, লোমশ ভেড়া এবং মুরগী, তিব্বতী পলা ইত্যাদি বিবিধ সামগ্রীর বাজার ব'সে যায়। ভূটান থেকে আসে বহু নরনারী। ত্রিশ-চল্লিশ মাইল অবধি পেরিয়ে এখানে তারা আসে অনায়াসে। বলা বাহুল্য, চাউল, ডাল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী, কাপড় চোপড় এবং মনোহারী—মোটামুটি সবই পাওয়া যায় হাটে। তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লম, তরবারি, হেঁসো, রামদা, কুক্‌রি, ছোরা,—মেলে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আমরা হাটের মধ্যে কাটালুম।

কালচিনি নদীর পথ ধ'রে যেতে হয় মহাকালের দিকে। পথটি দুঃসাধ্য। একটা দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছতে হয়, কিন্তু দল বেঁধে যাওয়াই ভালো। পাহাড়তলীতে ব'য়ে যাচ্ছে কালচিনি নদী, এবং নদীর কোলে একটি মস্ত গুহার মধ্যে মহাকালের দেউল। গাছের ডাল ও বাঁশ দিয়ে তৈরী একটি সাঁকো পেরিয়ে সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করতে হয়। ওরই কাছাকাছি ঘন জঙ্গল আর পাহাড়বেষ্টিত ভূটানী বস্তিব পাশে রয়েছে ফাঁসখাওয়া মহাকালের আশ্রম। ভোরবেলায় যাত্রা ক'রে সন্ধ্যার আগে না ফিরতে পারলে অসুবিধার অন্ত থাকে না। আরেকটি তীর্থস্থান আছে কাছাকাছির মধ্যে। সেটি হলো বানেশ্বর। এই বানেশ্বর গ্রামে বসে শিব-রাত্রির মেলা। নানা অঞ্চল থেকে এই বানেশ্বরের শিবমন্দিরের বাগানে নরনারীর সম্মেলন হয়। আলিপুরদুয়ার থেকে বেরিয়ে কোচবিহারের পথে বানেশ্বরের যাবার সুবিধা আছে।

আগামী কাল আমাকে চ'লে যেতে হবে। আর মাত্র একটি রাত্রি এই আলীপুরে বাস করবো। কাল প্রত্যুষে শিউলি ফুল ঝ'রে পড়বে গাছ থেকে।

অপরাহ্লের দিকে চা-বাগান আর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আমরা রায়ডাক বস্তির দিকে চললুম। রোদ হেলেছে পশ্চিমে। জঙ্গলের পথ ছেড়ে হাটের লোকেরা ফিরছে তাদের গন্তব্যস্থলে। ঘোড়া গরু ছাগল কিনেছে অনেকে। বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়েরা চলেছে কোলের শিশুটিকে কাপড়ের সাহায্যে পিঠে ঝুলিয়ে। আমরা এসে ঢুকলুম একটি বাড়িতে। এক বৃদ্ধ নেমে এলেন। তাঁর নাম অন্নদা রায়। বহুলোকের মুখে আগে থেকে শোনা ছিল, তিনি সমগ্র জলপাইগুড়ি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিকারী। কপিশ-

বর্ণ চক্ষু দেখলে কাথাটা অবিশ্বাস করা যায় না। এখন তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। অরণ্য অঞ্চলেই তাঁর চিরদিনের বাস, টিম্বারের কাজকর্ম ও সার্ভের কাজ করতেন। তিনি একটি চায়ের আসর বসিয়ে তাঁর সহজ সংযত ভাষায় শিকারের গল্প বলতে লাগলেন। এমন সব কাহিনী যে, এই অপরাহ্ন-কালেও যেন আমাদের চারিপাশ সংশয়াচ্ছন্ন উঠলো। চারটির বেশী তিনি হাতী মারতে পারেননি, এটা ক্ষোভের কথা বটে। পাগলা হাতীরা তাঁকে চিনে রেখেছে। পায়ের আওয়াজে বাঘেরা বুঝতো, এ ব্যক্তি অন্নদা রায়। অগণ্য ব্যাঘ্র-হত্যা ঘটেছে তাঁর শিকারী-জীবনে। ঘন জঙ্গলকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই। তুমি দেখছো না কিছু, কিন্তু তারা অতি কাছে থেকে তোমাকে লক্ষ্য করছে। নরখাদকরা মানুষের পায়ের দাগ চিনে মানুষকে খুঁজে বার করে! ভালুকরা একবার ভয় পেলে আর পিছনে তাকায় না।

তাঁর বিভিন্ন রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে আমি মুগ্ধ!

সূর্য নামলো অস্তাচলের দিকে; পথ আমাদের এখনও অনেক দূর। অন্নদা রায়কে শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানিয়ে আমরা একসময়ে বিদায় নিলুম।

সন্ধ্যায় পরে এলেন শ্রীযুক্ত কুমুদকান্তি মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি আলীপুরদুয়ারের শ্রেষ্ঠ শিকারী। অবশ্য তাঁর ব্যাঘ্রশিকারের সংখ্যা এখনও পঞ্চান্নটির বেশী ওঠেনি। আমি মধ্যরাত্রে তাঁর সঙ্গে অরণ্যে প্রবেশ করতে উৎসুক, এজন্য তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর কাছে অন্নদা রায় ও পুলিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করতে তিনি দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালেন। বললেন, অমন অসমসাহসিক শিকারী বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে গৌরব। সাহেব-সুবো শিকারীরা পর্যন্ত সেলাম ঠুক্‌তো। আমি আড়ালে শুনলুম, কুমুদকান্তি দুর্ধর্ষ সাহস নাকি ওঁদের অপেক্ষাও বেশী। এমন উৎকর্ণ ও লক্ষ্যবিদ্‌ শিকারী নাকি জলপাইগুড়িতে কোনোদিনই পাওয়া যায়নি।

কুমুদকান্তির চল্‌তি নাম হোলো—খুদুবাবু। তিনি হাসিমুখে বললেন, আজ বড্ড বেশী চাঁদের আলো, শিকার খুঁজে পাবো কিনা বলা কঠিন। কিন্তু আপনার পায়ে যদি একটি কাঁটাও ফোটে তবে আলীপুরের লোকেরা আমার রাইফেল্‌ নিয়ে আমাকেই গুলি করবে!

বললুম, আপনি বাঘ মারতে পারবেন, খুতুবাবু ?

পারবো।

কতক্ষণের মধ্যে ?

ঘণ্টা ছয়েকের ! তবে আজ নয়। এত চাঁদের আলোয় অসুবিধে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত আপনি থাকুন, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে বাঘ মারবো। একটা 'ম্যান্-ঈটার' বেরিয়েছে পরশু দিন থেকে। খবর রাখছি তার ! চেষ্টা করছি ওটাকে শুক্রবারে মারবো,—সেদিন রাত তিনটের আগে চাঁদ উঠবে না।

বললুম, আপনাদের এই অঙ্কের হিসেবে বাঘ বেরোয়,—এরা কি সব পোষা বাঘ নাকি ?

সবাই হাসলেন। খুবুবাবু বললেন, বনজঙ্গলের মানুষ, ওই হিসেবটাই শুধু শিখতে পেরেছি।

খুতুবাবুও টিম্বারের ব্যবসা করেন দমনপুরের ওদিকে। কথাবার্তার পর ঘণ্টা দুই বাদে তিনি প্রস্তুত হয়ে এলেন। সঙ্গে জীপগাড়ী, দুটি সশস্ত্র চাকর ও একজন সহকারী। সঙ্গে দুটি দোনলা বন্দুক ও দুটি রাইফেল্। সকলেরই কালো কালো পোশাক। আমারও পরনে কালো কোট প্যাণ্ট। খুতুবাবু সঙ্গে নিলেন একটা শক্তিশালী টর্চ এবং রাইফেলের সঙ্গে বেঁধে নিলেন অত্যুগ্র স্পট্‌লাইট্। রাত্রি দশটার পং আমরা যাত্রা করলুম।

এরই মধ্যে নিশুতি হয়ে গেছে আলীপুরদুয়ার। জীপ-গাড়ীর দ্রুতগতির আশেপাশে কোথাও একটি জনপ্রাণী নেই। আকাশভরা জ্যোৎস্না যেন সমগ্র আলীপুরের মাথার ওপর দপদপ ক'রে জ্বলছে। চন্দ্র যেন আজ সূর্যেরই বিপরীত মূর্তি,—কেবল সূর্যের দীপ্তদাহর বদলে যেন তুহিনের স্নিগ্ধ মায়াবরণ টানা। ডিসেম্বরের শেষ প্রান্তে এসেছি, হিমালয়ের তুষারের বাতাস নেমেছে সূচিবিদ্ধ করতে। দূরের সেই ধূমেল আবিল তুহিন-প্রান্তটি ছাড়িয়ে দমনপুরের পাশ কাটিয়ে আমাদের মোটর এসে প্রবেশ করলো মহারণ্যের তোরণদ্বারে। রাত এগারোটা বাজলো। গাড়ী চালাচ্ছেন খুতুবাবু, হাতের কাছে তাঁর গুলিভরা রাইফেল্। একটি মুহূর্তে গাড়ী থামিয়ে পর-মুহূর্তে রাইফেল তোলা যায়, এ তিনি জানেন। আমি

তাঁর পাশে বসেছি। আমার দিকটা খোলা। অরণ্যপথে কিছুদূর এসে তিনি একবার শান্ত ইঙ্গিতাত্মক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর ইশারার মূল বক্তব্যটি আমার আগে থেকে জানা।···শিকার অন্বেষণে এসে কখনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে নেই। গাড়ী-ঘোড়ার রাস্তায় এসে যারা এপার থেকে ওপারে ছুটতে যায় কোনোদিক না দেখে, তারাই গাড়ীচাপায় মরে। জঙ্গলে এসে ছুটফট ক'রো না, কথা ব'লো না, হেসো না, সিগারেট ধরিয়ো না, তুড়ি দিয়ো না, জুতোর শব্দ ক'রো না, হেঁচো না, গুঞ্জন ক'রো না, অনাবশ্যক টর্চ জ্বালিয়ো না,—এই দশটি আজ্ঞা পালন করবে মনোযোগ দিয়ে!···বলা বাহুল্য, আমি ঘাড় ফিরিয়ে ইশারায় তাঁকে আশ্বাস দিলুম।

আসবার আগে মনীষী রায় বলেছিলেন, খুদু, মনে রেখো, বার্কিং ডীয়ারের মাংস সকলেরই সুস্বাদু লাগে!

খুদুবাবু হেসেছিলেন। আমি প্রশ্ন করেছিলুম, বাঘ মারতে পারবেন না তবে এত আয়োজন কেন সঙ্গে?

খুদুবাবু জবাব দিয়েছিলেন, জঙ্গলকে বিশ্বাস করিনে।

অরণ্যের ভিতর প্রশস্ত মোটরপথ দূরদূরান্তরে চ'লে গেছে। এটা সরকারী রিজার্ভ ফরেষ্ট, ঠিকাদারের দল ছাড়া অন্য শিকারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু আমার মোহাবিষ্ট চোখের সামনে জ্যোৎস্নারাত্রিক স্বপ্নলোক ঘন অরণ্যের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিলো। চৈতন্যবিন্দুর উপর যেন আমার দেহহীন অস্তিত্ব। জীপ চলেছে দ্রুতগতিতে, আমি ভেসে চলেছি শুক্লপক্ষে। অরণ্যাত্মার রহস্য রূপ চারিদিকে প্রতিভাত। হেডলাইটের আলোয় বহুদূরে কোন্ প্রাণীর দুটো চোখ যেন চক্‌চক্ করে, কাছে পৌঁছবার আগেই মিলিয়ে যায়! অদূরে একটি জানোয়ার নিঃশব্দে পথের ওপারে ছুটে গেল প্রায় দুশো গজ দূরে। সহসা থামলো গাড়ী। কি যেন দেখলেন খুদুবাবু। তাঁর হাত পড়লো রাইফেলে। আমি বাঁ হাতে তাঁর হাত চেপে ধরলুম। থাক, জন্তুজানোয়ার সহ অরণ্যের শোভা আরো কিছুক্ষণ দেখতে দিন। রক্তপাতে কাজ নেই। খুদুবাবু হেসে চুপ করে গেলেন। গাড়ী বাঁক নিল অন্যপথে। চললো এবার অনেকদূরে পানবাড়ী ছাড়িয়ে। চললো রায়ঢাকের দিকে।

আবার ঘুরলো জয়ন্তীর পথে। কিছু দেখতে বা বুঝতে পাচ্ছিনে। সমস্তটা জ্যোৎস্নায় আর জঙ্গলে জটিল। একটা অবাস্তব অনাস্বাদিতপূর্ব রাত্রির অনুভূতি,—তার বর্ণনা বাহুল্য। সমস্ত মন থর থর করছে আনন্দে কিংবা আতঙ্কে, বলা কঠিন।

খুতুবাবু একস্থলে এসে গাড়ী থামালেন। অদূরে আগুনের আভা দেখছি। আমাদের হেডলাইট পড়েছিল সেখানে। পাশে একখানা ট্রাক পড়ে রয়েছে এবং তারই পাশে কয়েকটি লোক তাঁবু ফেলে জটলা ক'রে বসেছিল। এরা খুতুবাবুর লোক। তারা এগিয়ে এসে কী যেন গাছ কাটাকাটির কথা বললো। কিন্তু আমি বিস্ময়বিমূঢ়, তাদেরকে এখানে এইভাবে রাত্রিবাস করতে দেখে। খুতুবাবু আসবার সময় বললেন, ওরা বাঘের গায়ে গায়ে থাকে, অনেক সময় চোখোচোখি হয়, কিন্তু কেউ কারোকে ভয় পায় না। ভয় পেলে এ ব্যবসা চলে না। এবার আপনি একটা সিগারেট খেয়ে নিতে পারেন।

ঠাণ্ডায় হাত হু'খানা অসাড় হয়ে এসেছিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার চললো জীপ। এবার অন্য পথে! সমস্ত অরণ্যটা যেন লেহন করেছি মনে মনে। ওর মধ্যে আছে পাহাড়ের বাঁক, আছে বড় বড় শীতের ফুল, আছে পথভোলা এক-আধটা পাইন, অসংখ্য অর্কিড, নানা-বর্ণের পত্রপল্লব। ওর মধ্যে নালিপথ বেয়ে চলেছে ঝরণা কুলকুলিয়ে, পাশেই কাটা শালের গুঁড়ি, ছোটখাটো ডালপালার সাঁকো, শিকারের মাচান, পরিত্যক্ত মোটর ট্রাক। বিশ্বাস ক'রে নিলুম মুখ বুজে রয়েছে অনেক লোক জঙ্গলের এখানে-ওখানে। ওদেরই আশে পাশে আমাদের গাড়ী চলছে দ্রুতগতিতে। ওরা সমস্ত মন অধিকার ক'রে রইলো আমার। ঘন অরণ্যের এই বিভীষিকার মধ্যে ওদের এই রাত্রিযাপন—বিস্ময়ে আমাকে অভিভূত করেছিল।

হঠাৎ থামলো জীপ। কী যেন! আরো, আরো কাছে! কী যেন! খুতুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে টর্চ ফেললেন পথের পাশে। আমরা দেখিনি এতক্ষণ, কিন্তু আমাদের দেখছে অরণ্য-চারীরা অপলক চক্ষে। টর্চের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দাঁড়ালো। একটি হরিণ। চাহনীতে কী কৌতূহল, কী আশ্চর্য সরলতা। আলো ঘোরালেন খুতুবাবু, ধীরে ধীরে চ'লে গেল হরিণ।

জীপ এগিয়ে চললো, আবার হঠাৎ টর্চের আলো ছুটে গেল লতাপাতা ডাল-পালার ফাঁকে। মস্ত এক সম্বর দাঁড়িয়ে। দেখছে আলোটার দিকে, এমন আলো এ-জীবনে সে দেখেনি। মাত্র দশ-বারো হাতের মধ্যে, প্রাণভয়ের উপলব্ধি এখনও আসেনি ওর চোখে, এখনও শান্ত কৌতূহল। না, ওকে মেরে কাজ নেই,—অমন নিস্পৃহ মধুর দৃষ্টি, অমন সুকুমার পেলব দেহ, অমন লাস্যময় ভঙ্গী,—থাক্, হত্যায় কাজ নেই! এমনি একটির পর একটি, পথে পথে যেন জন্তুর প্রদর্শনী ব'সে গেছে। ওর মধ্যে আছে নালগাই, ষ্ট্যাগ,—ওরই মধ্যে নানাবর্ণ। আমাদের মুহূর্তের চাঞ্চল্য,—অমনি ওরা পালাবে উর্ধ্বশ্বাসে!

আবার গাড়ী চললো দূর থেকে দূরে। পরিপূর্ণ তৃপ্তি আমার দুই চোখে। এমন ক'রে এত নিকটে ওদেরকে দেখিনি কোনোদিন।

কিন্তু ভাববার অবকাশ ছিল না। মাইল-পাঁচেক গিয়ে হঠাৎ হেড-লাইটের সামনে পড়লো একটি জন্তু। পথের ধারে হেঁট হয়ে কি যেন খাচ্ছিলো। এবার উদ্দাম হয়ে উঠলো খুড়ুবাবুর শিরার রক্ত। প্রায় কুড়ি গজ পিছনে গাড়ী থামিয়ে তিনি রাইফেল নিয়ে নেমে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে জন্তুটা গা ঢাকা দিল। উৎকর্ণ, সজাগ, সতর্ক খুড়ুবাবু এগিয়ে গিয়ে স্পটলাইট আটকানো রাইফেল তুললেন। কোন্ দিকে তাঁর লক্ষ্য জানিনে। আমরা কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছিনে। এক, দুই, তিন,—দড়াম ক'রে গুলির শব্দ হোলো। তারপর সব অন্ধকার। আলোটা নিবিয়ে একবার দাঁড়ালেন খুড়ুবাবু। মিনিট দুই। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে এলেন। আবার স্তব্ধ চারিধার,—জ্যোৎস্নায় নিঃঝুম সেই মায়ালোক।

সহসা আমাদের ডান পাশে জঙ্গল-জটলার মধ্যে গাছপালা ভাঙার মটমট শব্দ শুনে চকিতে উৎকর্ণ হলুম। বুনো হাতী! শুঁড় দিয়ে ডাল পাকিয়ে গাছ ভাঙছে! আমরা অন্ধকারে স্তব্ধ। এমন সময় ভিতর থেকে তারস্বরে ডেকে উঠলো কাকার-হরিণ। ডাকতে ডাকতে কাকার পালালো দূরে। খুড়ুবাবু ফিস্ফিস্ ক'রে বললেন, টাইগার!

হাতী ভাঙছে ডাল আমাদের পাশে। ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে ওত পেতে আমাদের লক্ষ্য করছে বাঘ। আমরা কতক্ষণ স্তব্ধ। জ্যোৎস্না বাঁচিয়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন খুড়ুবাবু। আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাস। কিন্তু যে গুলিটা তিনি ছুঁড়লেন একটু আগে, তার ফলাফল কি দাঁড়ালো?—আবার সুদীর্ঘ দু মিনিট চুপ। না, আর কোনো সাড়া শব্দ নেই।

কিন্তু বন্দুক নিয়ে সবাই প্রস্তুত। সহকারী সুধীর গুপ্তভায়া পর্যন্ত সতর্ক। ধীরে ধীরে কাছে এসে খুতুবাবু ভৃত্যকে বললেন, ওটাকে পেয়েছি, তুলে নিয়ে এসো।

ওরা জানতো খুতুবাবুর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু ওরা ছিল বন্যহস্তী আর বাঘের অপেক্ষায়। যখন কোন সাড়া আর নেই, তখন ভৃত্যটি গেল খুতুবাবুর সঙ্গে। জঙ্গলে গিয়ে সে ঢুকলো, পিছনে টর্চ হাতে সশস্ত্র খুতুবাবু। তিন মিনিটের মধ্যেই তুলে নিয়ে এলো অতি গুরুভার একটি বার্কিং ডায়ারের মৃতদেহ,—এরই নাম কাকার-হরিণ। ওষ্ঠাধরের ফাঁক দিয়ে ছুটি দাঁত একটু-খানি বেরিয়ে এসেছে। লম্বা পাঁস্মুটে মুখ। ছোট ছোট শিং। গায়ের উপর কালো ছাপ। নধর ও সুপুষ্ট জীব। মনীষী রায়ের অনুরোধ রাখলেন খুতুবাবু!

মৃত হরিণটিকে গাড়ীর মধ্যে নিয়ে আমরা যখন সেখান থেকে যাত্রা করলুম তখন রাত প্রায় দেড়টা।

সেই গভীর রাত্রে দমনপুর জঙ্গলের ধারে টিম্বারের গদিতে চা খেয়ে এবং 'মাঝের-দাবড়ি' চা-প্রাসাদে ঢুকে মনীষী রায়কে এই সুসংবাদটি দিয়ে যখন সুধীরবাবুর ওখানে ফিরলুম, তখন আর হিসেব করিনি, রাতটুকু শেষ হতে আর কত বাকি।

পরদিন প্রত্যুষে উঠে আবিষ্কার করলুম, মৃত হরিণের রক্তে ভেসে যাচ্ছে সুধীরবাবুর একটি ঘর। গুলি লেগেছে হরিণের পেটে, সেখান থেকে তখনও অশ্রান্ত রক্ত ঝরছে!

রক্ত ঝরছে তখনও, যখন সেই হরিণের ছিন্নভিন্ন দেহ বাক্সবন্দী হয়ে রেলপথে এলো আমার সঙ্গে কোচবিহারের বিমান-ঘাঁটিতে; এবং বেলা আন্দাজ সাড়ে-দশটায় ছেড়ে সেই বিমানটি যখন দমদমের ঘাঁটিতে এসে পৌঁছলো প্রখর রৌদ্রে,—তখনও ঝরছিল সেই রক্ত! অনেক রক্ত ঝরে গেল আকাশ-পথে, দেশ-দেশান্তরের প্রান্তরে, নীলাভ পদ্মার কোন প্রান্তে, পাকি-স্তানে, বিহারের সীমানায়। দমদম বিমানঘাঁটি থেকে আসবার সময়ে মোটরের ছাদের থেকে সেই রক্ত গড়িয়ে ঝরতে লাগলো কলকাতার পথে পথে! অরণ্যের হৃদয়কে বিদ্ধ করা হয়েছে, সে-রক্ত কোনমতেই শুকোতে চাইলো না।

বাড়ীর প্রায় সকলেই উল্লাসের মাঝখানে বিষণ্ণ মন চুপ ক'রে রইলো।

গত রাত্রি যেন গত জীবনের রূপকথার মতো সামনে দাঁড়িয়ে। কোথায় যেন একটা মস্ত ক্ষতি আর অন্যায় ঘটে গেছে !

জামশেদপুর থেকে অনেক দূর। ধলভূম পেরিয়ে মোটর চলেছে দূর থেকে দূরে। হেমন্তের প্রভাতে তখনও তন্দ্রার জড়তা মাখানো, তখনও শীতের কাঁটা দিচ্ছে গায়ে। অনেক দূরে গেলে তবে চাইবাসা।

কেউ কেউ বলে, এটি ভারতের প্রাচীনতম ভূ-ভাগ। এখানকার যারা আদিবাসী তারাই হোলো সুপ্রাচীন জম্বুদ্বীপের প্রকৃত বাসিন্দা, তারাই নাকি প্রথম ভারত-পরিচয়। তুই পাশে সেই আদিবাসীদের গ্রাম প্রান্তর, আর তারই মাঝে মাঝে টিলা পাহাড়—যেমন দেখা যায় হায়দরাবাদে সেই অজন্তার প্রান্তরে—আদি পাথরের জটলা। একখানি পাথরের সঙ্গে অনেকখানির মৃৎ বন্ধন গেছে ক্ষয়ে, পরস্পরের মধ্যে স্নেহের ডোর নিশ্চিহ্ন—কেবল আপাদ-মস্তক রুক্ষ দৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নগ্ন কৃষ্ণাভ জরাগ্রস্ত একখানা পাথরের খণ্ড। ভয় করে ঝড় ঝাপ্টায় ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে পড়ে বুঝি।

মোটর চলেছে। সামনে ওই চাইবাসার শীর্ণ ঋজু পথটি বারবার চোখের সামনে ধরছিল যেন নিরুদ্দেশের সংকেত, বারবার যেন ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল হাজার হাজার বছর পিছনের ইতিহাসে। সেই ইতিহাস শোনেনি কেউ, খবর পাওয়া যায় না তার'—কিন্তু তার এক-একটি অনুচ্ছেদ আপন আপন চিহ্ন রেখে গেছে একটির পর একটি টিলা পাহাড়ে—যেমন সে স্বতন্ত্র, তেমনি যূথভ্রষ্ট। ভূতত্ত্ববিদরা বলে, এদের বয়স অনেক, হিমালয়ের চেয়েও নাকি বেশী। আজ নতুন কালের মানুষ এসে তাদের রাজ্যপাট বসিয়েছে, মাঠে মাঠে ফসল ধরেছে নতুন কালের জন্য, প্রতি জনপদ জনাকীর্ণ হয়ে চলেছে,—কিন্তু ওই আরণ্যক আদিবাসী আর আদি পাহাড়ের দল নিত্য গতিশীল ভারত সভ্যতার মাঝখানে লক্ষ লক্ষ বছরের একটা অতি প্রাচীন চেতনা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা যেন কথায় কথায় পর্যটকের চক্ষুকে বিভ্রান্ত করে।

পৃথিবী বিস্ময়কর, মাটি যেখানে নতুন। চাইবাসা ছাড়িয়ে আবার চলেছি নতুন পথে। যাচ্ছিলুম সিংভূমের দিকে। বহুকাল থেকে রোমাঞ্চ এনেছে আমার মনে সিংভূমের অরণ্য-লোক। যখন আধুনিক সভ্যতা তার বিজয় রথের ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে নানাদিকে, মানুষ তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ জ্বালালো পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র—তখন সিংভূম যেন তার সমস্ত ভয়াল

অন্ধকার অরণ্যানী নিয়ে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যপাদ অবধি তপস্বার মতো, একান্তে চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলো। তার সেই চেহারাটি দেখার প্রবল কৌতূহল ছিল আমার মনে।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন চাইবাসার প্রসিদ্ধ 'কাঠুরিয়া' বন্ধুবর হরেন্দ্র হুই। টিম্বারের ব্যবসায়ে তিনি সিদ্ধার্থ। তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত আতিথেয়তা আমাদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল। আমি অরণ্য ভ্রমণে বেরিয়েছি শুনে তিনি একটি ভ্রমণ-তালিকা বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় নতুন সঙ্গী হলেন ইনকাম ট্যাক্সের একজন ঊর্ধতন কর্মচারী এবং সাহিত্য-সুরসিক বন্ধুবর দুর্গাপ্রসাদ। উনি দর্শন-শাস্ত্রের এম-এ। বিহারী হলেও বঙ্গ সাহিত্যের একান্ত অনুরক্ত।

গাড়ীর গতি অতি দ্রুত! স্বয়ং হরেন্দ্র চালক এবং গতি-পিপাসু। এদের যিনি গাড়ীর মালিক তিনিই অগতির গতি। দুর্গাপ্রসাদ টিপ্পনী কাটলেন, হরেন্দ্রর হাতে আমাদের গতি কি দুর্গতি ঠিক বুঝিনে। তবে দূর-গতি বটে! সে যাই হোক, আমরা চক্রধরপর ছাড়িয়ে সোনুয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম।

কিছু দূর গিয়ে ষ্টেশন সীমানা পেরিয়ে পথ এবার ঘুরে গেল। রাঙ্গা-মাটির পাথুরে পথ চলে গেছে অরণ্যের দিকে। আশে-পাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা পার্বত্য ভূমি। কোথাও কোথাও আদিবাসীদের হাটতলা, কোথাও বা গত বর্ষার আঘাতে পথের উপরে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। কিন্তু ওদেরই ভিতর দিয়ে রাঙ্গা মাটির যে পথ চলে গেছে অরণ্যলোকে সেইদিকে আমাদের একাগ্র আকর্ষণ। মাঠের পর মাঠ,—তারা যেন আমাদের সামনে রঙ্গীন পতঙ্গ দলের রাজসভায় পরিণত। গ্রাম কেবলমাত্র আর গ্রাম থাকে না, সে হয়ে দাঁড়ায় ছবি। সাম্প্রতের আবরণ উঠে যায় তার উপর থেকে। দেখতে দেখতে যেন কল্প-কল্পান্তের দাগ পড়ে। জানা জিনিসকে মনে হতে থাকে কতকালের অজানা। একান্ত মনের ভাবনাটাকেই যেন সন্দেহ হয়। তন্দ্রার আবেশ। সোনুয়া গ্রাম বটে, কিন্তু প্রধানতঃ সেটি পথের সঙ্কেত—সেইটিই তার বৈশিষ্ট্য। জনবিরল গ্রাম, দু'চার ঘর চাষীদের বস্তী। কাজের মধ্যে এসব অঞ্চলের প্রধান কাজ হোলো লোভী জন্তু-জানোয়ারের কবল থেকে পাকা ফসলকে সর্বদা রক্ষা করা। এখানে এসব গল্প প্রায় নিত্যই চলে কোন্ জন্তুর সঙ্গে কোন্ মানুষের কবে লড়াই হয়ে গেছে। হিংস্র জানোয়ার আর মানুষ এখানে বড় কাছাকাছি বাস করে। উভয়ের সম্পর্কটা হোলো বিদ্বেষের। একজনের তৈরী ফসল আরেকজন এসে চুরি করে খায়,—ফলে একজনের সেই আদিম বিদ্বেষ ও ঘৃণা আপন নখরে নিজেকে শাণিত করে।

শুধু জঙ্গলে কেন, শিক্ষিত গৃহস্থ ঘরেও ত এই। বিড়ালে দুধ খেয়ে পালালে গৃহস্থের বউ তার পিছনে খুন্তি নিয়ে তাড়া করে। কুকুর একটু ভদ্র, আগে থেকে ল্যাজ নেড়ে আবেদন জানায়।

প্রায় মধ্যাহ্নকালে আমরা এসে পৌঁছলুম রেলপথের ধারে একটি কাঠুরিয়া পল্লীতে। হেমন্তের পাখীরা নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। হঠাৎ যেন সমস্তটা শান্ত। সমস্ত কোলাহলের বাইরে, সমস্ত সভ্যতার বাইরে। কালের পর কাল চলে গেছে, যুগের পর যুগ—এদের কিছু স্পর্শ করেনি। যতদিন অরণ্য, এরা ততদিন। অনন্তকাল ধরে চেয়ে রয়েছে এক একটি শাল গাছের দিকে, সেই গাছটি কতদিনে কাটা চলবে। জীবিকার প্রথম পর্যায়ে কোনো পরিশ্রম নেই, কেবল বর্ষায় ও বসন্তে বনভূমির দিকে চেয়ে থাকা। নীচে দিয়ে চলেছে হাতীর পাল, হরিণের দল, ভালুকের অভিযান, সাপ-সরীসৃপ-পতঙ্গদলের রাজ্যপাট—কিন্তু কাঠুরিয়ার চোখ পড়ে থাকে বনে বনে। শীতের শেষে লাল হতে থাকে শাল, পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার বন, কিশলয়ে কিশলয়ে রক্ত ধারা ঝরতে থাকে, অরণ্যে অরণ্যে আসে মধুর গন্ধের উত্তেজনা—আর ভালুকেরা সেই উন্মাদনায় এসে শালের বনে আনন্দে ওলোট-পালট খায়। উপর থেকে রঙ্গীন পাখীরা সেই কৌতুকে কল-কূজন আরম্ভ করে দেয়।

বানরের পাল এসে ফুল চটকে বেড়ায় ফলের লোভে। আর সকলের নীচে অতি সন্তর্পণে লেপার্ড এসে ওৎ পাতে কাকার হরিণের আশায়। মানুষের চোখের বাইরে মানবেতর প্রাণীর মস্ত রাজ্যপাট।

গ্রামটির নাম গোয়েলকেরা। পিছনে মস্ত পাহাড় এবং তারই কোন অলক্ষ্য দিয়ে বয়ে চলেছে বন্য নদী 'কারো'। গ্রামের তিন দিকে ঘন বনের ছায়া এবং এই কাছাকাছি ছাড়া মানুষের বসতি কম। এখানে অন্য কয়েকজন টিম্বার ব্যবসায়ীর মতো আমাদের হরেন্দ্র দুই মশায়েরও মস্ত কারবারের ঘাঁটি। জঙ্গলের কোলের মধ্যেই মোটামুটি সকলের বসবাস এবং ওরই মধ্যে মানুষের নিত্য প্রয়োজনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিপণি বেসাতির কাজ-কারবার। কাছেই একটি ডাক বাংলো এবং সেখানকার ব্যবস্থাদি ভদ্র। কিন্তু আমাদের কাছে হরেন্দ্রর কুঠিবাড়ীর আকর্ষণ অনেক বেশী। সেজন্য প্রায় অপরাহ্ণের প্রারম্ভে আমরা এসে তাঁর ওখানেই উঠলুম।

বাতাস দিয়েছে হেমন্তের, রাত্রের দিকে ঠাণ্ডা নামবে। এমন নৈঃশব্দ চতুর্দিকে—যেন সহসা আমরা সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, আমাদের আধুনিক

পরিচয়টা গেল মুছে। নতুন মাটির টান আমার মধ্যে—অভিনবত্বের রোমাঞ্চকে উপলব্ধি করছি চারিদিকে। স্থানীয় বিবরণ কিংবা ভৌগোলিক সংস্থায় আমাদের দরকার ছিল না—কারণ আমাদের প্রধান আস্বাদটি আনন্দের। কতক্ষণে আমরা ভয় পাবো সেই আনন্দ; হঠাৎ চকিতের দর্শন মিলবে,—সেই উন্মুখ প্রত্যাশা। অরণ্যলোকে এসেছি তাই পদে পদে আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন মন। এ যাত্রায় আমার সঙ্গে ছিল সাহিত্যিক বন্ধু পবিত্র গাঙ্গুলী। তার স্থায়ী আবাস হোলো কলকাতার হট্টগোলে। সে এখানে এসে রস পাচ্ছে কম, কারণ সে অনেক কাজ ফেলে এসেছে। কাজের মানুষ এসে ছিটকে পড়েছে বাঘ ভালুকের জঙ্গলে তাই সে কেবল এবেলা ওবেলা পালাবার পথ খুঁজছিলো। আমার চেষ্টা তাকে ভুলিয়ে রাখা এবং তার কাজ কর্ম পণ্ড করা। এদিকে হরেন্দ্র তাঁর অশান্ত ও বিচক্ষণ আতিথেয়তার গুণে আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই অতি প্রিয় হয়ে উঠেছেন।

সন্ধ্যার কাছাকাছি শেষ শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্না দেখা দেবে এবং আমরা অরণ্যের শোভা দেখতে যাবো এই ছিল আমাদের অনুষ্ঠান লিপি। ইতিমধ্যে দুর্গাদাস ছাড়া আরেকজন ডেপুটি ফরেষ্ট অফিসার আমাদের সঙ্গে মিলেছেন। তিনি এসেছেন অরণ্যে—তদন্তের কাজে। তিনি পাঞ্জাবী যুবক, নাম আর. সি. প্রসাদ। ভালো মোটর চালান এবং সাহসী ব্যক্তি। বিকালের দিকে রাইফেল এবং বন্দুক সঙ্গে নিয়ে আমাদের গাড়ী ছাড়লো পাহাড়ে দিকে শালবনে। এই সুবিস্তৃত পাহাড়ের ঢালু প্রান্তটাই হলো গোয়েলকেরা গ্রাম। গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা গেল আমাদের বসতির এই বিশাল পটভূমিটি কি প্রকার। ছোট গ্রামের সীমানা ছাড়া মাত্রই জানা গেল, সন্ধ্যার আগেই মানুষ এইানে ঘর-দরজা বন্ধ করে। পাহাড় উঠে গেছে নানাদিকে, তার সঙ্গে অরণ্য মিলিয়ে সমস্তটাই নিরেট নিঃঝুম। ওরই মধ্যে পথ, ওরই মধ্যে হঠাৎ এক আধজন দল-ছাড়া আরণ্যকের আনাগোনা। আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন মন প্রতিপদে বাস্তবিকই খুঁজে ফিরছিল যে কোনো জন্তু, যে কোনে মানবেতর জীব। কিন্তু একথা আমাদের জানা দরকার ছিল যে, দলবল মিলে গাড়ী ও বন্দুক সুদ্ধ কোলাহলরত আমরাই হলুম সেদিন অরণ্যচারীদের লক্ষ্যণীয় বস্তু। তারা সামনে এসে পড়েনি এই কারণে যে, আমাদের আচরণই তাদেরকে আমাদের সামনে আসতে দেয়নি।

দুর্গাপ্রসাদ হলেন ইনকাম ট্যাক্সের লোক এবং হরেন্দ্র হলেন ব্যবসায়ী। উভয়ের সম্পর্কটা হোলো ইঁদুর-বিড়ালের এবং সেজন্য উভয়ের মধ্যে পরিহাস

বির্তর্ক ছিল। চালক হরেন্দ্র বলছিলেন, পাহড়ের উপর থেকে মোটর দুর্ঘটনা হ'লে খুশী হই—দুর্গাপ্রসাদের হাত থেকে রেহাই পাই। তাঁর হাতে ষ্টিয়ারিং সুতরাং আমরা ভয়ে আড়ষ্ট। দ্রুতগামী মোটরখানি পাহাড় থেকে ছিটকে পড়লে অন্তত দেড় হাজার ফুট নীচের দিকে গড়াবে। অতঃপর পরিণামটি কিরূপ দাঁড়াবে এই ভেবে নিরীহ পবিত্র গাঙ্গুলীর গলাটা শুকিয়ে উঠলো। হাতী কতক্ষণে তার ভয়ানক শুঁড় বাড়াবে আমাদের গাড়ীতে, অথবা কতক্ষণে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর—সেই আতঙ্কের সঙ্গে মোটর দুর্ঘটনার সম্ভাব্যতা মিলিয়ে আমরা একেবারে ভয়ে কাঠ! ত্রাহি মধুসূদন!

উত্তুঙ্গ পাহাড়ের শিখর পল্লীর কাছাকাছি গিয়ে আমরা একটি স্থানে নামলুম। এখানে একটি স্থান-সঙ্কেত চিহ্নিত রয়েছে। ঘন-পার্বত্য জঙ্গল তিনদিকে, উত্তর অশংটা অবারিত। সেখানে দাঁড়ালে প্রায় দু'হাজার ফুট নীচে 'কারো' নদীর ধারাটি চোখে পড়ে। সিংভূমের প্রাকৃতিক শোভা এখানে মনোরম নীচের দিকে পাহাড়ের চারিপাশে অন্তহীন অরণ্যলোক। মানুষের আবাস চিহ্ন কোথাও কিছু নেই। ওখানে পাল বেঁধে হাতীরা আসে, একা বাঘ এসে জলপান করে যায়, সন্ধ্যার দিকে 'কাকার' ডাকতে থাকে, তা'ছাড়া. ওদিকে নাকি বড় বড় সরীসৃপ ঘুরে বেড়ায় ছোট ছোট জন্তুর লোভে। সমগ্র অরণ্য রহস্যময় হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যায় সূর্য অস্তে নামছে। 'কারো'র জলে পড়েছে তার ছায়া। এদিকে মৃদু জ্যোৎস্না ঘন হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। আশেপাশে অরণ্যের আঁকে-বাঁকে কেমন যেন রহস্য-সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের পথ দিয়ে দু'একটি খরগোস এদিকে-ওদিকে ঘুরে গেল। যারা হিমালয়ে ভ্রমণ করেছে তাদের কাছে এসব দৃশ্য নতুন নয়! কিন্তু তবু বন্ধুদের উল্লাস ছিল অপরিসীম। মিঃ প্রসাদ তাঁর রাইফেলটি নিয়ে অলক্ষ্য শিকারের আশায় সর্বক্ষণ সজাগ হয়ে রইলেন। কিন্তু নৈরাশ্য নিয়েই তাঁকে সেই জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় ফিরে আসতে হোলো।

বন জঙ্গলের শীত প্রবল। পুরোপুরি শীতকাল এখনো আসেনি। তবু নভেম্বরের এই তৃতীয় সপ্তাহে হরেন্দ্র তাঁর ঘরে এসে আগুন জ্বালতে বাধ্য হলেন। বন্ধ ঘরের মধ্যে আগুন না জ্বেলে বাস্তবিক উপায়ও ছিল না। এ অঞ্চল নাকি ডিসেম্বরের শেষ দিকে তুহিন রাজ্যে পরিণত হয়।

গোয়েলকেরা থেকে মনোহরপুরে আমরা গেলুম একটি মালগাড়ীতে—রেলপথে। সদলবলে একটি চলন্ত মালগাড়ীকে থামিয়ে আমরা গার্ডের

বারান্দায় উঠে বসলুম। আমাদের গন্তব্য হোলো ভারত বিখ্যাত সারান্দার শালবন। গাড়ী চললো ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এবং একটি সুড়ঙ্গ পথ পেরিয়ে। এ যাত্রাটা ছিল বড় আনন্দের। মালগাড়ীর নীরস গতি সকলের সম্মিলিত কোলাহলে যেন মুখর হয়ে উঠলো। মাত্র আঠারো মাইল পথ, কিন্তু ওরই মধ্যে বিচিত্র জগৎ. সৌন্দর্যের অমরাবতী, শালবনের ছায়ায় ছায়ায় যেন মায়াকাননের আভাস—অপ্সরালোকের ইশারা। এ পৃথিবী সুন্দর, কিন্তু ভূসর্গের সমস্ত মহিমা নিয়ে এই নিত্য ভারতের পথ—আলোয় ছায়ায় মায়ায় এর তুলনা আর কোথাও আছে বলে মনে করিনে।

মনোহরপুরে এলুম তখন ভরা মধ্যাহ্ন। এখানে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সতীশ হাজরা মহাশয়ের কুঠি রেলপথের ধারেই। তিনি কেঁদ পাতার ব্যবসায়ী,—যে কেঁদ পাতায় বিড়ি তৈয়ারী হয়। তিনি স্বকৃত ব্যক্তি। বর্তমান অজস্রতার মধ্যে তিনি বসবাস করেন। তাঁর ওখানে স্নানাহার সেরে আমরা মোটর ট্রাকে যাত্রা করলুম ঝরাইকেলায়। গাড়ী জোগালেন ভাটিয়া এক প্রবীণ ব্যবসায়ী। তিনিও একজন টিম্বার প্রিন্স। কাঠ কাটেন জঙ্গলে এবং সেগুলি ভারতীয় রেলওয়ের জন্য চালান দেন। তাঁর গাড়ীতে আমরা ঝরাইকেলার দিকে রওনা হলুম। বলা বাহুল্য, আমরা এখন রয়েছি আদিবাসীর দেশে। কিন্তু এবার যাচ্ছি তাদের অন্দর মহলে। মনোহরপুর ছাড়ামাত্রই আমরা সারান্দার অরণ্যে এসে প্রবেশ করলুম। সূর্য তখন প্রখর, কিন্তু আমরা ছায়ালোকের মধ্যে হারালুম। এর আগে 'কারো' নদীর কথা বলে এসেছি। পাহাড়ের তলা দিয়ে অথবা অধিত্যকার পাশ কাটিয়ে 'কারো' নদী চক্রাকারে ঘুরেছে সারান্দার অরণ্যলোকে! কিন্তু মনোহরপুর পেরিয়ে গিয়ে গভীর অরণ্যের মধ্যে পাওয়া গেল কোয়েল নদী। সেই জনহীন জটাজটিল অরণ্যের ভয়-বাসার মধ্যে গিয়ে পবিত্র গাঙ্গুলী বললে, জীবনে এমন অভিজ্ঞতা নতুন! এ আমি কখনও দেখিনি। সূর্যহারা দিকহারা পথহারা নিবিড় বনভূমি—যেখানে পদে পদে ভয় আর সংশয়! যেখানে প্রতি বনস্পতি আর শিকড়ের জটলার দিকে তাকালে প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষির তপস্যাশীর্ণ চেহারাকে মনে পড়ে।

সারান্দার অরণ্যে 'কয়না' নদীটি হোলো প্রধান। মোটামুটি সত্তর মাইল বনের মধ্যে দিয়ে এই নদী এসে মিশেছে 'কোয়েলে'র ধারার সঙ্গে। এর জলে যেমন ধাতব পদার্থ তেমনি ঔষধি গাছ-গাছড়ার রস মিশানো। 'কয়না নদী হোলো নিত্যস্রোতা। এর জল কখনও শুকোয় না। এ নদী সমগ্র

সারান্দার প্রায় সমস্তটাকে বেষ্টন করে চলেছে। 'কয়না', 'কোয়েল' এবং 'কারো' ছাড়াও আরেকটি নদী সারান্দায় পাওয়া যায়—তার নাম 'শামতা'। 'শামতা' উপত্যকায় যে নিবিড় শালশ্রেণী দেখা যায়, ভারতের কোথাও তার তুলনা মেলে না। নদীর শাখা-প্রশাখাগুলিও আশ্চর্য। বনের সঙ্গে নদীর শোভা মিলিয়ে পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নদীর শাখা-প্রশাখার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে উপত্যকা আর অধিত্যকা—লতায়-পাতায়, ফলে ফুলে অরণ্যের বিবিধবর্ণ পুষ্পে এবং ওষধি গাছ-গাছড়ায় তারা যেন নন্দনের অনৈসর্গিক দৃশ্য চোখের সামনে মেলে ধরেছে।

আমরা ধীরে ধীরে বনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। ঠিক কি দেখছি জানিনে, কিন্তু চুপ করে দেখছি। সৌন্দর্য অপেক্ষা মহিমার উপলব্ধি। দৃষ্টি আমাদের আবেশে তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু দেখাটা চলছিলো মনপ্রাণ দিয়ে। চম্পকের বন যাচ্ছে পেরিয়ে, মাঝে মাঝে চকিত মৃদু সৌরভের ইসারা পেয়ে দেখতে পাচ্ছি কদম্ব.বৃক্ষের শোভা, দেখতে পাচ্ছি ওরই মধ্যে রক্তরাঙ্গা শিমুলের সমারোহ। ঋতু হিসেবে এখন অসময়, কিন্তু বনলোকে নাকি প্রায়ই ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। চারিদিকে দীর্ঘ ঋজু শালপ্রাংশু—উর্ধ্বায়িত, গগনচুম্বী। দিনমানকে তারা রেখেছে অন্তরালে, সূর্যকে এই নিস্তব্ধ ছায়ান্ধকার গাম্ভীর্যের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি। এদেরই মধ্যে কোথায় যেন আছে 'রঙ্গনগড়া'—সেখানকার ভূস্বর্গে নাকি অনেক শিল্পী ছবি আঁকতে যায়। সমস্ত সারান্দার বনের তুলনায় সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। মানুষের দৃষ্টির সামনে নানাবর্ণের ইন্দ্রজাল রচনা করে বলেই হয়ত নাম দেওয়া হয়েছে রঙ্গনগড়া।

ঝলাইকেলাতে এসে আমরা একটি পাহাড়ী তাঁবুর মধ্যে পেলুম ফরেষ্ট অফিসার ও বিহারী লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহকে! ইনি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Round the World-এর লেখক এবং সত্য সত্যই পৃথিবীর পর্যটক। তাঁর কথা আগে আমাদের শোনা ছিল। তিনি আমাদের আসামাত্রই একটি চায়ের আসর বসালেন। তাঁর সেই সুন্দর ডাকবাংলোর তলা দিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে চলে গেছে রেলপথ। এ অঞ্চলটিও প্রধানতঃ টিম্বার ব্যবসায়িগণের কেন্দ্র। আমাদের বন্ধু পরলোকগত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই এ অঞ্চলে আসতেন এবং যোগেন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে অরণ্য ভ্রমণে বেরোতেন। বিভূতিভূষণের নানা স্মৃতিকথা নিয়ে আমাদের সেদিনের অপরাহ্ন-কালটি যেন দিনান্তের আকাশের মতোই বিষণ্ণ হয়ে এলো।

পরদিন পুনরায় আমরা অরণ্য অভিযানে বেরুলাম। এবার আমরা যাচ্ছি আরো নিভৃতলোকে। সমস্তটাই আর্বত্য অরণ্যে ভরা। কোথাও তার বিশেষ ছেদ নেই ? মোট তিনশো তিরিশ বর্গমাইল নিয়ে এ সারান্দর বন। দক্ষিণ আমেরিকাকে বাদ দিলে পৃথিবীর উচ্চতম শালবন এই সারান্দার জঙ্গলে পাওয়া যায়। এক একটি গাছ চোদ্দ ফুট মোটা এবং একশো তিরিশ ফুট উঁচু। অনেকের কাছে শুনেছি ভারতে এমন গাছ আর কোথাও পাওয়া যায় না। সমগ্র সারান্দায় নাকি মোট সাতশো ছোট বড় পাহাড় মিলিয়ে এই জগদ্বিখ্যাত শাল-শ্রেণী জন্মায়। সেজন্যে এই অঞ্চলের অপর নাম হোলো 'সাতশো পাহাড়ের দেশ।'

অরণ্যের নেশা লেগেছিল আমাদের। গভীর থেকে গভীরতম অঞ্চলে আমাদের গাড়ী কখনও নামছে, কখনো উঠছে। মাঝে মাঝে কদম্ব-চম্পকের শোভা দেখছি। অত্যন্ত নিরিবিলি গহনলোকে দেখতে পাচ্ছি আম-জামের বন। ছোট ছোট মিষ্টি আম পাকলে হাতী আর বনশূয়োর এসে খেয়ে যায়। যতগুলি পাহাড় আছে এ অঞ্চলে তার মধ্যে সর্বোচ্চ চূড়াটির নাম হোলো সারংদা বুরু। বুরু অর্থে পাহাড়,—'হো' জাতির ভাষা। এই সারংদার মালভূমির উপর রয়েছে পুষ্করিণীর মতো নাবালভূমি,—সেখানে একটি দিকে বাঁধন থাকলে চমৎকার হ্রদ হতে পারতো। এই তড়াগের ধারে আসে সর্বপ্রকার বন্যজন্তুর দল। শিকারের পক্ষে খুব উপযোগী অঞ্চল। এ ছাড়া আরো কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। যেমন বুধ বুরু, গুয়া ঝুরু ইত্যাদি। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে দেখা যায় হিংস্র বাইসন্। অরণ্যে তারা ভয়াবহ জীব। পথের মাঝে মাঝে ক্বচিৎ এক আধ জন 'হো'-কে দেখতে পাচ্ছি। এরা থাকে ছোট ছোট বস্তিতে একেবারে লোকচক্ষের বাইরে। জলপাইগুড়িতে যেমন 'বাহে', কোচবিহারে যেমন 'কোচ'। এদের মধ্যে অনেকেই মিশনারিদের পাল্লায় পড়ে খৃষ্টান হয়েছে। কেউ কেউ আবার এদের মধ্যে মুণ্ডা শ্রেণী অন্তর্গত। সারান্দার দক্ষিণ অঞ্চলে এক শ্রেণীর গোয়ালারা থাকে, ওড়িয়া হলো তাদের ভাষা। কিন্তু মোটামুটি জনসাধারণের ভাষাটাই হোলো 'হো'।

সারান্দার মাঝামাঝি অঞ্চল পেরিয়ে জেট নামক বসতি ছাড়িয়ে আমরা 'টেবো' পাহাড়ে এসে পৌঁছলুম। বেলা মধ্যাহ্নে গড়িয়ে গেছে। এখনও আমরা যাবো অনেক দূরে। পবিত্র গাঙ্গুলী আজ তিনদিন পরে অরণ্যের স্বাদ পেয়েছে,—মনে তার আনন্দের জোয়ার এসেছে। দুর্গাপ্রসাদ কলমুখর।

হরেন্দ্র রস পাচ্ছেন শাল-শ্রেণীর নিখুঁত চেহারায়! আমি এতক্ষণে মোটামুটি এই মহারণ্যের ব্যাস ও পরিধির অনুধাবন করতে পেরেছি এই হলো আমার কৌতুক। দেখতে দেখতে এক সময় নানা পার্বত্য পথ পেরিয়ে 'রোগড' নামক ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছলুম। এই ডাকবাংলোর তিনদিকে সুউচ্চ পাহাড় গভীর জঙ্গলে আকীর্ণ। ডাকবাংলোর সামনে একটি নাতি-বৃহৎ প্রাঙ্গণ, কিন্তু তার বাইরে দিনের বেলায় পা বাড়াতেও গা ছমছম করে! বিশেষ বিশেষ কালে এই ডাকবাংলোর সামনে আসে হাতী, বাঘ, ভাল্লুক এবং সেই আদি ও অকৃত্রিম বন্যশূকর। মানুষ ছাড়া যে কোন প্রাণীর এখানে নিত্য আনাগোনা। বনবিভাগ থেকে যাঁরা এ অঞ্চলে তদন্ত করতে আসেন, তাঁদের সকলেরই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। পাগলা হাতীর ভয় আছে প্রচুর।

বাংলোর ভিতরে এসে আমরা দেখা পেলুম অন্য একজন ডেপুটি ফরেষ্ট অফিসারের। তিনি হলেন শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর বর্মা। তিনি সহাস্য স্বাগতমের দ্বারা আমাদের চারজনকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এমন সৌজন্য ও মিষ্ট স্বভাব সচরাচর চোখে পড়ে না। তাঁর সঙ্গে গল্প শুরু হোলো। বন্যহাতী এ অঞ্চলে প্রচুর। তারা শস্যক্ষেত্রগুলি আক্রমণ করে —যখন ধান আর ভুট্টার পাক ধরে। অনেক সময় তারা চাষীর ঘর-বাড়ী আক্রমণ করে ক'রে সঞ্চিত শস্যের ভাণ্ডার লুট করে নিয়ে যায়। বাঘ আছে অনেক, তবে নরখাদকের সংখ্যা কম।

বাইসন, সম্বর হরিণ, শূকর—এখানেও সংখ্যালঘু নয়। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে পাইথন হরিণ শিশুর লোভে। এ ছাড়া আছে সবুজ বর্ণের বিষধর সর্প।

আমরা উত্তরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। এখান থেকে দূরে দেখা যায় চক্রধরপুরের দিককার দিগন্তব্যাপী সমতলক্ষেত্র। পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকা থেকে যেমন ধূসর সুদূর প্রান্তর। আমাদের এবার গন্তব্যস্থল হোলো চক্রধরপুর। কিন্তু সেখানে সন্ধ্যার আগে পৌঁছান সম্ভব নয়।

বিদায় নেবার আগে শ্রীযুক্ত বর্মা আমার হাতে কিছু উপহার দিলেন। সেই উপহারের চেহারা লোভনীয় বটে, তবে তাতে হিঁদুয়ানীর অংশ ছিল কম। বিশেষ পাখীর কথা বলছি।

মোটর আমাদের ছেড়ে চললো আবার জঙ্গলের দিকে। রাঁচি রোড ধরে আমরা যাবো চক্রধরপুরের দিকে। বেশ লাগলো বর্মা সাহেবের বাংলো।

কিন্তু 'রোগড' ছাড়াও আরো এইরূপ কয়েকটি বাংলো রয়েছে এই সারান্দায়। যেমন জামদা স্টেশন থেকে ষোলমাইল দূরবর্তী কুমডি। সেরাইকেলা থেকে থলকোবাদ—গহন অরণ্যলোকে। মনোহরপুর থেকে কুড়ি মাইল দূরে ছোটনাগরা। এ ছাড়া থলকোবাদের পথে তিরিলপোসি কিংবা সারান্দার সীমানাবর্তী নোয়াগাঁও। তা'ছাড়া সলাই ও আনকুয়া ইত্যাদি বাংলোও পাওয়া যায় এ-পথে ও-পথে।

দেখতে দেখতে অপরাহ্লের দিকে আমরা এসে পৌঁছলুম চক্রধরপুর রোডে। প্রশস্ত পিচঢালা মসৃণ চিক্কণ রাজপথ। পথের দুই পাশে পার্বত্য অরণ্য কিন্তু এমন রাজপথেও কোনো জনমানবের চিহ্ন দেখছিনে। এটি রাঁচি যাবার পথ। কিন্তু পরন্ত বেলায় যানবাহনাদি আর বিশেষ চলে না। পথের পাশেই দেখছি হাতী 'নাদ' ফেলে গেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেই পথের এপার থেকে ওপার জন্তুজানোয়ারের চলাফেরা বাড়তে থাকে।

প্রাত্যহিক জীবনধারার বাইরে যে কালটুকুতে ভ্রমণ করি, সেটি অপ্রাকৃত, বিচ্ছিন্ন, কিন্তু পরিপূর্ণ। সেটির অমৃত আস্বাদ হোলো দীর্ঘস্থায়ী। দুর্গাপ্রসাদ, হরেন্দ্র, গৌরীশঙ্কর, যোগেন্দ্র—এদের সঙ্গেই সেই আস্বাদ জড়ানো। এরা যদি এসে দাঁড়ায় প্রত্যহের বৈষয়িক জীবনে—তবে তাদের সত্য পরিচয় পাওয়া যাবে না। অমনি করে যেতে হবে অরণ্যে ওই সংশয়, আশঙ্কার মধ্যে, অমনি বেপরোয়া দিনযাত্রায়—তবেই ওদের সুপ্রকাশ। যে পথ দিয়ে মন ছোটে' মোটর ছোটে, সেই পথেই ওদের সঙ্গে আমার মন পড়ে রইলো। ওরা জড়িয়ে রইলো আরণ্য কল্পনায়, অন্ধকার রাত্রের ভূতের গল্পে, জ্যোৎস্না-লোকিত নিঃসঙ্গ বনভূমির মায়ালোকে, কাঠুরিয়ার কুঠিবাড়ীর আগুনের আভায়, ওরা জড়িয়ে রইলো একটি বিশেষ খণ্ডকালের নামহারা, পরিচয়হারা বাসাহারা জীবন।

চক্রধরপুর ষ্টেশনে এসে যখন রাত্রে ট্রেনে উঠলুম—ওরা সবাই প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু প্রখর আলোয় ওদের যেন আর চিনতে পারলুম না!

শেষ